বাংলাদেশের দারিদ্র্য ও খাসজমিতে ভূমিহীনদের অধিকার

উত্তরণ

প্রাককথন

বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যা এখন প্রায় ১৫ কোটি এবং ১৯৭১ সালে এক রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ এবং তিরিশ লক্ষ মানুষের জীবনের বিনিময়ে বাংলাদেশ একটি স্বাধীন দেশ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। জনগণের প্রত্যাশা ছিল, স্বাধীনতা অর্জন দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে তাদের লড়াইকে আরও জোরদার করে তুলবে এবং তারা দারিদ্র্যকে পরাজিত করতে সক্ষম হবে। কিন্তু বাস্তবে সেটা ঘটেনি। কারণ আমরা জানি, ১৯৭১ সালে আমাদের দেশে প্রায় ৪ কোটি লোক দারিদ্র্যসীমার নিচে বাস করতো। বর্তমানে সরকারি হিসাব মতে প্রায় ৭ কোটি লোক দারিদ্র্যসীমার নিচে বাস করছে। তাই বলা যায়, স্বাধীনতা উত্তরকালে দারিদ্র্য কমেনি বরং দরিদ্র মানুষের সংখ্যা প্রায় ৩ কোটি বৃদ্ধি পেয়েছে। যদিও সরকারি এবং বেসরকারিভাবে দারিদ্র্য দূর করার জন্য নানান ধরনের কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে, বাস্তবে তা দারিদ্র্য বা দরিদ্র মানুষের সংখ্যা কমাতে সহায়তা করেনি। তাছাড়া আমরা জানি, গত প্রায় এক যুগ ধরে বাংলাদেশের অর্থনীতির প্রবৃদ্ধির হার ৫ থেকে ৬ শতাংশের মধ্যে স্থির হয়ে রয়েছে এবং তা কোনক্রমেই ৭ বা তার অধিক হারে উন্নীত হচ্ছে না। বিশেষজ্ঞরা মনে করেন, অর্থনীতিতে প্রবৃদ্ধি ৭ বা তার অধিক হারে অর্জন করার জন্য আভ্যন্তরীণ ভোগের পরিমাণ বাড়াতে হবে অর্থাৎ দরিদ্র মানুষের ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধি করতে হবে। বস্তুত, তাদের কোন ক্রয়ক্ষমতাই নেই। প্রকাশ থাকে যে, উত্তরণ দীর্ঘদিন ধরে হতদরিদ্রদের দারিদ্র্যমুক্ত হতে সহায়তা করে আসছে এবং আমাদের দীর্ঘ অভিজ্ঞতায় আমরা দেখেছি যে হতদরিদ্রদের উৎপাদনশীল উপকরণের মালিকানা অর্জনে সহায়তা করলে তা তাদেরকে দারিদ্র্যের দুষ্ট চক্র হতে বের হতে সহায়তা করে। কারণ হতদরিদ্ররা সাধারণত একক আয়ের উৎসের উপর অর্থাৎ শুধু তার নিজের শ্রম বিক্রির উপর নির্ভরশীল এবং তা অনিয়মিত। উৎপাদনশীল উপকরণের মালিকানা অর্জনের সাথে সাথে হতদরিদ্র পরিবারের আয় বহুমুখী হয়ে উঠে এবং তখন সে শুধু অনিশ্চিত এবং অনিয়মিত শ্রমের উপর নির্ভরশীল থাকে না। অধিকন্তু উৎপাদনশীল উপকরণ তথা একখণ্ড জমির মালিকানা তার সাংস্কৃতিক এবং মানসিক চেতনার পরিবর্তন ঘটাতে সহায়তা করে এবং দারিদ্র্যকে পরাজিত করার আকাঙ্ক্ষাকে করে তোলে তীব্র। এক হিসেবে দেখা গেছে, বাংলাদেশ সরকারের হাতে ৩৩ লক্ষ একর খাস জমি আছে এবং এই খাস জমি ভূমিহীনদের কাছে হস্তান্তরের জন্য ১৯৮৪ সালে প্রণীত একটি আইনও রয়েছে। তাই বাংলাদেশের হতদরিদ্র কৃষকদের মাঝে যদি এই খাস জমি সরকার দ্রুত বণ্টন করে, তাহলে যেমন বাংলাদেশ হয়ে উঠবে দারিদ্র্যমুক্ত, তেমনি হতদরিদ্রদের ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধির ফলে বাংলাদেশের অর্থনীতির প্রবৃদ্ধির হার হয়ে উঠবে ঈর্ষণীয়, যা দ্রুত আমাদের দেশকে একটি সমৃদ্ধিশালী দেশ হিসেবে গড়ে উঠতে সহায়তা করবে।

শহিদুল ইসলাম
পরিচালক
উত্তরণ

সুচিপত্র

ভূমিকা	০৪
১. দারিদ্র্য বিমোচন ও দারিদ্র্য পরিস্থিতি	০৪
২. বাংলাদেশের দারিদ্র্যের কারণ	০৬
২.১ রাষ্ট্রীয় ব্যয় বরাদ্দ	০৬
২.২ সমানুপাতিক কর ব্যবস্থা	০৯
২.৩ প্রচলিত ব্যাংক ব্যবস্থা	০৯
২.৪ গরীব মানুষের সংগঠনের অভাব	১০
২.৫ রাজনৈতিক সিদ্ধান্তহীনতা	১০
২.৬ দারিদ্র্য ও ভূমিহীনতার ঐতিহাসিক কারণ	১১
৩. বাংলাদেশের দারিদ্র্য বিমোচনে গৃহীত সরকারি ও বেসরকারি প্রচেষ্টা	১৩
৩.১ সরকারি প্রচেষ্টা	১৪
৩.২ বেসরকারি প্রচেষ্টা	১৪
৩.৩ খাসজমি বন্টনে উত্তরণের ভূমিকা	১৭
৪. দারিদ্র্য জয়ের কৌশল হিসেবে রাষ্ট্রীয় সম্পদ হস্তান্তর- কিছু সাফল্যগাঁথা	১৮
৫. আইনি সুযোগ ও সীমাবদ্ধতা	২২
শেষকথা	২৬

সম্পাদক
শহিদুল ইসলাম

সম্পাদনা পর্ষদ
আমিনুর রহমান বাবলু
ফাতিমা হালিমা আহমেদ
সোনিয়া তাহেরা কবীর
জাকির কিবরিয়া

প্রকাশকাল
সেপ্টেম্বর ২০১০

কভার ডিজাইন/গ্রাফিক্স : শেখর কুমার বিশ্বাস / এস. আকাশ, অংকুর, খুলনা। ৮১৩৮৬০
মুদ্রণে : প্রচারণী প্রিন্টিং প্রেস, খুলনা।৮১০৯৫৭

ভূমিকা

স্বাধীনতা উত্তরকালে সামাজিক ক্ষেত্রে বাংলাদেশের অগ্রগতি দক্ষিণ এশিয়ার অন্যান্য দেশের তুলনায় কিছু ক্ষেত্রে ঈর্ষণীয়। পাশাপাশি এর অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির হারও বেশ ভালো। গত দুই দশক ধরে দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির ধারা ক্রমান্বয়ে উর্ধ্বমূখী এবং তা বর্তমানে ৬ শতাংশের বেশি। দক্ষিণ এশিয়ার কমবেশি স্থায়িত্বশীল অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিসম্পন্ন দেশগুলোর অন্যতম বাংলাদেশ। কিন্তু দারিদ্র্য কমেনি দেশটির, বরং স্বাধীনতা উত্তরকালে দরিদ্রের সংখ্যা যেমন বেড়েছে তেমনি বেড়েছে ধনী-দরিদ্রের বৈষম্য। বাংলাদেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি দরিদ্রমূখী নয় বরং তা ধনীমূখী। ফলে বাংলাদেশে এক ধরণের সামাজিক অস্থিরতা বৃদ্ধি পেয়েছে বলে অনেকে মনে করেন।

১. দারিদ্র্য বিমোচন ও দারিদ্র্য পরিস্থিতি

সাধারণভাবে বলা হয়, বাংলাদেশের প্রায় ৭০% মানুষ দরিদ্র। গ্রামাঞ্চলে ৮০% এর বেশী মানুষ দরিদ্র। এদের মধ্যে হতদরিদ্রের সংখ্যা ৩০% এর মত। ১৯৭২ সনে ৭ কোটি মানুষের মধ্যে প্রায় ৪ কোটি দারিদ্র্যসীমার নিচে ছিল। বর্তমানে ১৫ কোটি মানুষের মধ্যে প্রায় সাড়ে ৬ কোটি দারিদ্র্যসীমার নিচে জীবনযাপন করছে। দারিদ্র্য বিমোচনই বাংলাদেশের সামনে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ । কথাটা নানাভাবে বলা হয়। তবে যেভাবেই বলিনা কেন, দরিদ্র মানুষের সক্ষমতা অর্জনই সবচেয়ে বড় কথা। আর মানুষের সক্ষমতা অর্জনের জন্য সবার আগে চাই তার অধিকার প্রতিষ্ঠা, সম্পদের উপর তার স্বত্বাধিকার প্রতিষ্ঠা। আমাদের সংবিধানে ধনী-দরিদ্রের ব্যবধান কমিয়ে আনার এবং নাগরিকদের নির্বিশেষে সমানাধিকারের কথা বলা হয়েছে।

দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য যা কিছুই করা হোক না কেন, দরিদ্রের সংখ্যা কিন্তু তেমন একটা কমছে না। বলা হচ্ছে, দারিদ্র্য বিমোচনের হার গ্রামাঞ্চলে ০.৩২% আর শহর এলাকায় ০.৫২%। এই হারে আগামী একশ বছরেও দেশ থেকে দারিদ্র্য দূর হওয়ার সম্ভাবনা নেই। অথচ দেশে প্রবৃদ্ধির হার বাড়ছে। প্রবৃদ্ধির হার গত দশকের প্রথমার্ধে ৪%-৫% হলেও দ্বিতীয়ার্ধে বেড়ে ৬% অতিক্রম করে এবং বর্তমান পর্যন্ত ৬% বা তার কিছু বেশি প্রবৃদ্ধি বাংলাদেশ ধরে রেখেছে। তবে প্রবৃদ্ধি বাড়লেই দারিদ্র্য যে কমে না, তা স্পষ্ট। এই সমস্যাকে আমরা কিভাবে মোকাবেলা করবো, এটাই এখন বড় প্রশ্ন।

বাংলাদেশের দারিদ্র্য পরিস্থিতি

দৈনিক খাদ্য গ্রহণের পরিমাণ বা উপার্জন (১ ডলার/দিন) যে হিসেবেই ধরা হোক না কেন, বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচি (World Food Program) এবং খাদ্য ও কৃষি সংস্থার (Food and Agricultural Organisation) হিসাব মতে, ২০০৯ সালে বাংলাদেশের ৩ কোটি ৫০ লক্ষ মানুষ দৈনিক ১৮০৫ কিলোক্যালোরীর কম খাদ্য গ্রহণ করেছে। এ জনগোষ্ঠী চরম দরিদ্র জনগোষ্ঠীর তালিকাভূক্ত। এক হিসাবে দেখা গিয়েছে, দেশের ৬ কোটি ৫০ লক্ষ মানুষ দৈনিক নূন্যতম খাদ্য চাহিদা মেটাতে অক্ষম (২১২২ কিলোক্যালোরী) যা তাদের দারিদ্র্য রেখা অতিক্রমে সহায়তা করেনি।

স্বাধীনতা পরবর্তীকালীন সময়ে দেখা গিয়েছে, দেশের খাদ্য উৎপাদন প্রায় ৩ গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। কিন্তু আন্তর্জাতিক বাজারে চালের উর্ধ্বমূল্য এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগ বাংলাদেশের দারিদ্র্য পরিস্থিতিকে আরও অবনতির দিকে ঠেলে দিয়েছে, দরিদ্র জনগোষ্ঠীর খাদ্য নিরাপত্তা ও পর্যাপ্ত খাদ্য প্রাপ্তি অনিশ্চিত করে তুলেছে।

বাংলাদেশের দারিদ্র্য পরিস্থিতির আর যে দিকটির অবনতি বিগত কয়েক বছরে দেখা গিয়েছে তা হচ্ছে আয় বন্টনে অসমতা। একটি দেশের ধনী ও দরিদ্র শ্রেণীর মধ্যে অর্থনৈতিক অসাম্য পরিমাপের জন্য ব্যবহৃত জিনি সূচকের ভিত্তিতে দেখা গিয়েছে যে, ১৯৮৩-৮৪ সালে বাংলাদেশের জিনি সূচক ছিল ০.৩৬। ২০০৫ অর্থবছরে তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ০.৪৬৭ এ। এ অর্থনৈতিক অসাম্য শুধু শহরাঞ্চলে সীমাবদ্ধ নয়। এটি গ্রামাঞ্চলেও এখন একটি প্রকট সমস্যা। ২০০৫ এ শহরাঞ্চলে জিনি সূচক ছিল ০.৪৯৭। গ্রামাঞ্চলে ০.৪২৮। এ বৃদ্ধি এটাই প্রমাণ করে যে, বাংলাদেশের আর্থিক প্রবৃদ্ধির সুবিধাভোগী হিসেবে সম্পদ কুক্ষিগত হচ্ছে কতিপয় মানুষের হাতে।

বাংলাদেশের আয় বৈষম্য বাড়ার এবং দারিদ্র্য পরিস্থিতির অবনতির উল্লেখযোগ্য কারণ হচ্ছে বিশাল অসংগঠিত কৃষি শ্রমিকের উপস্থিতি যারা মূলতঃ কায়িক শ্রমের উপর নির্ভরশীল, যাদের কোন উৎপাদনশীল উপকরণ যেমন জমি বা অন্যান্য সম্পদ নেই এবং যাদের দুই বেলা খাবার জোটে শ্রম বিক্রি করে। একটি গ্রামীণ জনপদ হিসেবে বাংলাদেশের জনসংখ্যার শতকরা ৮০ শতাংশের বেশী মানুষ গ্রামে বাস করে যারা কৃষিকাজের সাথে জড়িত। দেশের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জীবন ও জীবিকার অন্যতম প্রধান উৎস কৃষি। বাংলাদেশের জাতীয় আয়ের ২১ ভাগ কৃষি থেকে আসে এবং শ্রমশক্তির ৪৮ ভাগ কৃষি কাজের সাথে জড়িত। তবে কৃষিখাতের প্রবৃদ্ধি সাম্প্রতিক সময়ে উল্লেখযোগ্য হারে কমেছে যা শিল্প ও সেবা খাতের প্রবৃদ্ধির থেকেও কম। কিন্তু কৃষি খাতে শ্রমশক্তির অর্ন্তভূক্ততা সে অনুযায়ী কমেনি। ১৯৮০ সালে কৃষির অবদান জাতীয় আয়ে ছিল ৩০ ভাগ এবং ৬০ ভাগ শ্রমশক্তি এতে জড়িত ছিল। ২০০৭ সালে এ অবদান ২১ ভাগে নেমে আসলেও শ্রমশক্তির অংশগ্রহণের হার সে তুলনায় কমেনি (৪৮%)। এ থেকে বোঝা যায় শ্রমশক্তির একটি বিশাল অংশ এমন একটি সংকোচনশীল খাতে জড়িত যা তাদের আয়বৃদ্ধির কোন সুযোগ করে দিতে পারছে না। কিন্তু উক্ত পরিসংখ্যান থেকে এ সিদ্ধান্তে আসা যাবেনা যে, দেশের দারিদ্র্য বিমোচনে কৃষির ভূমিকা কমে আসছে এবং শিল্প, সেবা ও অন্যান্য খাত ক্রমেই বৃহত্তর অবদান রাখছে। গ্রামে কৃষির পাশাপাশি বিভিন্ন কুটির শিল্প, নির্মাণ সামগ্রী ইত্যাদি কাজে শ্রমিকদের চাহিদা থাকলেও তার পরিমাণ খুবই কম। কৃষি এখনও দারিদ্র্য বিমোচনের অন্যতম প্রধান হাতিয়ার হিসেবে বিবেচিত হতে পারে। কিন্তু ক্রমহ্রাসমান প্রবৃদ্ধি, জাতীয় আয়ে ক্রমহ্রাসমান অবদান, বৃহৎ শ্রমশক্তির অর্ন্তভূক্তি এবং কৃষিখাতে নিযুক্ত শ্রমিকের ক্রমহ্রাসমান আয় দারিদ্র্য পরিস্থিতির উন্নয়নে সহায়তা করছেনা। কৃষিখাতে নিযুক্ত শ্রমশক্তির ভূমিহীনতা এ পরিস্থিতিকে আরো সংকটাপন্ন করে তুলেছে। বর্তমানে দেশের গ্রামীণ জনসংখ্যার ২৭% ভূমিহীন এবং তারা সর্বোচ্চ ১০ শতাংশ জমির মালিক। তাছাড়া ক্রমাগত দরিদ্ররা তাদের জমি হারিয়ে ভূমিহীনে পরিণত হচ্ছে।

দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে পরিচালিত এক জরিপ হতে দেখা যায়, এ অঞ্চলে ১০ শতকের নিচে জমি আছে এমন পরিবারের সংখ্যা ২৭%। সরকারের হিসাব মতে এরা সকলেই ভূমিহীন। এদের গড় আয় ও গড় আয়ু দুটোই বেশ কম। এক হিসাব মতে এ জনগোষ্ঠীর দৈনিক গড় আয় ৭০ টাকা অর্থাৎ ১ ডলারেরও কম। এ সামান্য আয় দিয়ে দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতির বাজারে গড়ে ৫ জনের একটি পরিবারের খাদ্য ও অন্যান্য মৌলিক চাহিদা মেটানো অসম্ভব। কাজেই তাদের কাজ খুঁজতে হয় অন্যত্র এবং এ প্রক্রিয়ায় বাড়ে ধনিক শ্রেণীর উপর নির্ভরতা। ভূমিহীনের সংখ্যা বাড়লেও ধনীরা ভূমির ওপর তাদের নিয়ন্ত্রণ অধিকহারে প্রতিষ্ঠা করছে, বাড়ছে তাদের জমির পরিমাণ। এক হিসাবে দেখা গিয়েছে, মাত্র ১৭% গ্রামীণ পরিবার ৬৭ শতাংশ জমির মালিক। প্রতিটি ভূমির মালিক কমপক্ষে সাড়ে সাত একর বা তার বেশী জমির মালিক। গ্রামীণ ধনীরা গ্রামের বেশীরভাগ সম্পদ নিয়ন্ত্রণ করে। গবাদিপশু, পুকুর-জলাভূমি, শিল্প ও যানবাহন ইত্যাদির মাধ্যমে আয়-উন্নতির ওপর তাদের নিয়ন্ত্রণ বা কর্তৃত্ব প্রশ্নাতীত।

ভূমিহীনদের সংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি এবং তাদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা না থাকার কারণে গ্রামীণ অর্থনীতি দিন দিন খারাপ হচ্ছে। মওসুমভেদে শ্রমের প্রয়োজনীয়তার তারতম্য ছাড়াও প্রতি বছর ২০ লাখের মত তরুণ-তরুণী দেশের শ্রমশক্তিতে যোগ হচ্ছে। গ্রামীণ বেকার যুবশক্তিকে শহরের কোন কাজেও লাগানো যাচ্ছে না। কাজের খোঁজে শহরমূখী গ্রামীণ জনসংখ্যার তুলনায় শহর/নগর ছোট। শহরের ওপরে বেশি গুরুত্ব দেয়া, শহরেই বেশি বিনিয়োগ সত্ত্বেও দেশের এক-চতুর্থাংশ কর্মশক্তিকে কোন কাজে লাগানো যাচ্ছে না।

২. বাংলাদেশের দারিদ্র্যের কারণ

বাংলাদেশের ওপর মার্কিন সিনেটের এক সমীক্ষায় বলা হয়েছিলো, এদেশ নদ-নদী-খাল-বিল-জলাভূমি, উর্বরভূমি, জনশক্তি, প্রাকৃতিক গ্যাস ইত্যাদিতে সমৃদ্ধ এক দেশ। এর দ্বারা শুধুমাত্র খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি নয়, জনসংখ্যার হার দ্রুত বৃদ্ধি সত্ত্বেও বাংলাদেশ খাদ্য রফতানী করতে পারবে। [*Betsy Hartman and James Boyce, (1979). Needless Hunger*]। জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থার একটি প্রতিবেদনেও বাংলাদেশের সাফল্য ও সম্ভাবনার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এ প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, এদেশের নদীনালা খাল-বিলে যে পরিমাণ মাছ আছে সে বিচারে বাংলাদেশ সম্ভবতঃ পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে ধনী দেশ। (UNDP/FAO, 1979)। বাংলাদেশের জনশক্তির মধ্যেও নিহিত আছে সামনে এগিয়ে যাবার উদ্যম ও সাহস। রাষ্ট্রীয় উৎসাহ/প্রণোদনা দেয়া ছাড়াই খাদ্য উৎপাদন প্রায় তিনগুণ বাড়াতে সক্ষম হয়েছে বাংলাদেশের কৃষক। যথোপযুক্ত রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা ছাড়াই বাংলাদেশের শ্রমশক্তির এক বিরাট অংশ বিদেশের শ্রমবাজারে ঠাঁই করে নিয়েছে। কিন্তু রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতার বদৌলতে এবং ঔপনিবেশিক মানসিকতায় পরিপুষ্ট ধনী প্রভাবশালী গোষ্ঠীর অপতৎপরতার কারণে হতদরিদ্র মানুষের খাল-বিল-জলাভূমি-বনবাদাড় ইত্যাদি অর্থাৎ সাধারণ সম্পদের ওপর যে অভিগম্যতা ছিল সেটা ক্রমশঃ কমতে কমতে শূণ্যের কোঠায় এসে ঠেকেছে।

বাংলাদেশে দারিদ্র্যের প্রধান কারণ সম্পদহীনতা নয়, বরং সামাজিক, নীতিগত বা রাজনৈতিক সিদ্ধান্তহীনতা। এর অন্যান্য কারণের মধ্যে আছে জনস্বার্থের সাথে অসংগতিপূর্ণ রাষ্ট্রীয় ব্যয় বরাদ্দ, প্রচলিত ব্যাংক ব্যবস্থা, সমানুপাতিক কর ব্যবস্থা, গরীব মানুষের সংগঠনের অভাব এবং রাজনৈতিক ক্ষমতা কাঠামো ও প্রতিষ্ঠানে জনগণের কার্যকর প্রতিনিধিত্বহীনতা। দীর্ঘ দুশ' বছরের ঔপনিবেশিক শাসন ও স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশের জন্মের পূর্ববর্তী আর্থ-সামাজিক অবস্থা এবং সরকারি বিভিন্ন নীতিমালা ও আইনকানুন দারিদ্র্য অবস্থার সৃষ্টিতে প্রভাব বিস্তার করেছে।

২.১ রাষ্ট্রীয় ব্যয় বরাদ্দ

প্রতি বছর সাধারণত জুন মাসে সরকার পরবর্তী আর্থিক বছরের ব্যয় বরাদ্দ ঘোষণা করে। এ সময় সব সরকারই গতানুগতিকভাবে বলে থাকে, বাজেটটি তৈরী হয়েছে দরিদ্র মানুষের দরিদ্রতা নিরসনের জন্য। আর এ কারণে এটা গরীবের বাজেট। আসলে কিন্তু সংখ্যাগরিষ্ঠ দরিদ্র ও হতদরিদ্র মানুষের জন্য সরকারের ব্যয় বরাদ্দ খুবই নগণ্য, আর এ কারণেই দারিদ্র্য বিমোচন সম্ভব নয়। তাছাড়া ব্যয়ের প্রস্তাবনাগুলো দারিদ্র্য নিরসনের অনুকূল নয়। জাতীয় বাজেটের সিংহভাগ অর্থায়ন হয় রাজস্ব আয় থেকে এবং রাজস্ব আয়ের বৃহত্তর অংশ আসে দরিদ্রদের দেয়া কর থেকে। কাজেই জাতীয় বাজেটের সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি (সেফটিনেট প্রোগ্রাম) - শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও কৃষি খাতসমূহের বরাদ্দ কতটুকু দারিদ্র্য বিমোচনের অনুকূল, সেটা খতিয়ে দেখা দরকার।

ক. *সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি*

জাতীয় বাজেটে সমাজের দুর্বল অংশের জন্য সরকার প্রত্যক্ষ সহায়তার নামে কিছু বরাদ্দ রাখে যা সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি নামে পরিচিত। এর আওতায় সরকার ভিজিএফ, ভিজিডি, বয়স্ক ভাতা, বিধবা ভাতা ইত্যাদি সুবিধা দেয়। এটাই সরকারের বড় দারিদ্র্য বিমোচন কার্যক্রম। এটি চূড়ান্ত বিশ্লেষণে সরকারী ত্রাণ কর্মসূচি ছাড়া আর কিছু নয়। তাছাড়া গ্রামে কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচি নামে যেসব কার্যক্রম চলে, তার বেশিরভাগই দুর্নীতির কারণে গরীবদের তেমন কোন উপকারে আসে না। বরং তাতে যথেষ্ঠ রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হাসিল হয়। এ ধরনের কর্মসূচি থেকে একদিকে যেমন দুর্নীতিবাজরা লাভবান হয়, অন্যদিকে দুর্নীতি বাড়ে। কাজেই এ ধরনের কর্মসূচি দারিদ্র্য দূরীকরণে মোটেও সহায়ক নয় এবং কোন অবদানই জোগায় না। কারণ আমরা সকলেই জানি দারিদ্র্য দূর করার প্রধান উপায় হলো দরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা অথবা তাদের উৎপাদনশীল উপকরণের মালিকানা অর্জনে সহায়তা করা। তাহলেই দারিদ্র্য দূর হতে পারে। বর্তমানে দরিদ্ররা শুধুমাত্র অনিয়মিত শ্রম বিক্রির উপর নির্ভরশীল যা তাদের আয়কে বহুমূখী করতে সহায়তা করতে পারে না। অন্যদিকে তারা যদি উৎপাদনশীল উপকরণের মালিকানা অথবা নিশ্চিত কর্মসংস্থানের সুযোগ পায়, তাহলে তারা তাদের আয়কে বহুমূখী করতে সক্ষম হতে পারে। আয় যখন বহুমুখী হয় তখন দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে লড়াই এবং দারিদ্র্যকে জয় করাও সহজ হয়। সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির মাধ্যমে বিপুল পরিমাণ অর্থ যে প্রক্রিয়ায় দরিদ্রদের মাঝে বিতরণ করা হয়, তা দ্বারা তাদের দারিদ্র্য কিছুটা প্রশমিত হয় কিন্তু তারা এর সাহায্যে তাদের আয়কে বহুমূখী করতে সক্ষম হয়না। কারণ সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচী দ্বারা দরিদ্ররা কোন উৎপাদনশীল উপকরণের মালিকানা অর্জন করতে পারে না এবং এ কর্মসূচি দীর্ঘমেয়াদী নিশ্চিত কর্মসংস্থানের সুযোগও সৃষ্টি করতে সহায়তা করেনা।

খ. *শিক্ষা*

সরকারী দাবি মতে বাজেটের সর্বোচ্চ বরাদ্দ রাখা হয় শিক্ষা খাতে। এ নিয়ে বিতর্ক আছে। এই খাতের বরাদ্দ থেকে দরিদ্ররা কিভাবে উপকৃত হয় এবং তা দারিদ্র্য বিমোচনে কি ধরনের ভূমিকা রাখে, তা একটু খতিয়ে দেখা যাক। উত্তরণ ও পিপিআরসি পরিচালিত একটি গবেষণা থেকে জানা যায়, অতি দরিদ্র পরিবারের শতকরা ৮০ জন শিশুই প্রাথমিক শিক্ষা সমাপন করতে পারে না এবং ৪৭% শিশু প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনের আগেই ঝরে পড়ে। এটা ঠিক, সরকার শিক্ষকদের বেতন, স্কুলের অবকাঠামো নির্মাণে সহায়তা এবং কিছু সংখ্যক ছাত্র-ছাত্রীদের উপবৃত্তি ও পাঠ্যবই দিয়ে থাকে। কিন্তু এতে গরীব পরিবারের সন্তানদের প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্তি সুনিশ্চিত হয় না। এর একাধিক কারণ আছে। দারিদ্র্যের কারণে এই শিশুরা একদিকে যেমন পারিবারিক কাজে সহায়তা করে, অন্যদিকে তেমনি পারিবারিক আয় উপার্জনেও বাধ্য হয়। যার ফলে এরা নিয়মিত বিদ্যালয়ে যেতে পারে না, পাঠে মনোযোগী হতে পারে না। আর এদের বেশিরভাগই দূর্বল শিক্ষা ব্যবস্থার কারণে কিছুদিন বিদ্যালয়ে যাওয়ার পর ঝরে পরে। তাছাড়া সরকার যে সহায়তা দেয় তাতে এই শিশুরা নিয়মিত বিদ্যালয়ে যেতে পারে না এবং প্রাথমিক শিক্ষাও শেষ করতে পারে না। কাজেই এদের ঝরে পরা রোধ এবং শিক্ষা সমাপনের জন্য দুপুরের খাবার ও পোষাকসহ লেখাপড়ার সকল উপকরণ সরবরাহ, স্কুলের ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন, স্কুল পরিচালনায় দরিদ্রদের অংশীদারিত্ব প্রতিষ্ঠা, দরিদ্র শিশুদের উপযোগী স্থানীয় সময়ানুযায়ী পাঠদান ব্যবস্থা চালু করা ও স্কুলের পড়ার আনুষঙ্গিক ব্যয়ভার বহন ইত্যাদি দায়িত্ব সরকারকেই নিতে হবে। দরিদ্র ও অতিদরিদ্র পরিবারের শিশুরা যেহেতু প্রাথমিক শিক্ষাই শেষ করতে পারে না, তাই তাদের পক্ষে

মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক বা উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ সম্ভবপর হয় না। এজন্য মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষাখাতে সরকারের ব্যয় দরিদ্রদের কোন উপকারে আসে না। পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষার্থীদের জন্য মাথাপিছু সরকারী ব্যয় ৪০/ ৫০ হাজার টাকা এবং মেডিক্যাল, ইঞ্জিনিয়ারিং ইত্যাদির জন্য মাথাপিছু ব্যয় আরও বেশী। সবার জন্য শিক্ষা, সবার জন্য শিক্ষার সমান সুযোগ সুবিধা ইত্যাদি বলা হলেও উচ্চশিক্ষা খাতে সরকারী ব্যয় বরাদ্দ কিন্তু কোনভাবেই গরীবদের কোন উপকারে আসে না। উল্টো এতে বেশি করে তাদের বঞ্চনাই বাড়ছে।

গ. স্বাস্থ্য

স্বাস্থ্যখাতে ব্যয় কমানোর জন্য স্বাস্থ্যখাতকে বেসরকারীকরণ করা হয়েছে। ফলে ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে দেশজুড়ে বহু হাসপাতাল ও ক্লিনিক গড়ে উঠেছে। ১৯৮০ সালে যেখানে ৫১০ টি সরকারী হাসপাতাল ও ৩৯টি বেসরকারী হাসপাতাল দেশের স্বাস্থ্য সেবায় অবদান রাখত, ১৯৯৮ সালে বেসরকারী হাসপাতালের সংখ্যা দাড়ায় ৬২৬ এবং সরকারী হাসপাতালের সংখ্যা বেড়ে দাড়ায় ৬৪৭টি। এইসব বেসরকারি চিকিৎসা কেন্দ্রে সাধারণত বিত্তবানেরা চড়া দামে স্বাস্থ্যসেবা কেনেন। দরিদ্রদের স্বাস্থ্যসেবা পাওয়া খুবই দূরূহ। কেননা এই স্বাস্থ্যসেবা ক্রয়ের ক্ষমতা তাদের নেই। হতদরিদ্রদের তো একেবারেই নেই। বিশ্বব্যাংকের এক হিসাবে বলা হয়েছে, গ্রামীণ জনগোষ্ঠী তুলনামূলকভাবে খারাপ অবস্থানে আছে যেহেতু তাদেরকে শহুরে জনগোষ্ঠীর থেকে ১.৫ গুণ বেশী ভ্রমণ ও অপেক্ষা করতে হয় সেবা পাবার জন্য। অনেক সময় জরুরী প্রয়োজনে দরিদ্ররা সহায়সম্বল বিক্রি করে স্বাস্থ্যসেবা নিতে বাধ্য হয়। সরকারী চিকিৎসা কেন্দ্রে বরাদ্দ কমাতে কমাতে এমন পর্যায়ে এসে দাঁড়িয়েছে যে, এখানে দক্ষ জনবল, প্রয়োজনীয় ঔষধ এবং আনুষঙ্গিক সুযোগ-সুবিধা একেবারে নেই বললেই চলে। ১৬টি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপেক্সে পরিচালিত এক গবেষণায় দেখা গিয়েছে যে, অর্ধেক কেন্দ্র 'Non-functional' এবং বেশীরভাগ স্বাস্থ্য কেন্দ্রে জনবল এবং প্রয়োজনীয় চিকিৎসা সামগ্রী নেই। ব্যয় কমানোর নামে ইতোমধ্যেই সরকার ধীরে ধীরে সরকারী স্বাস্থ্য বিভাগকে ফসিলে পরিণত করেছে। সরকারী হাসপাতাল থেকে গ্রামের দরিদ্ররা একেবারেই কোন সুযোগ সুবিধা পাচ্ছেন না।

ঘ. কৃষি

এক সময়ে বাংলাদেশে জাতীয় আয়ের সিংহভাগ এবং বর্তমানে ২০%-২৫% আসে কৃষি থেকে। দেশের শ্রম শক্তির বৃহৎ অংশ অর্থাৎ প্রায় ৪৮ শতাংশ কৃষিতে নিয়োজিত। তাছাড়া গ্রামীণ এলাকায় মোট জনসংখ্যার ৮০% বাস করে এবং এরা কোন না কোনভাবে কৃষির সাথে জড়িত। দুর্ভাগ্যের বিষয় আন্তর্জাতিক সংস্থার হস্তক্ষেপের কারণে কৃষিতে সরকারের বিনিয়োগ অর্থাৎ জাতীয় বাজেটে বরাদ্দ খুবই কম রাখা হয়। এই বরাদ্দের মধ্যে যে ভর্তুকি দেয়া হয় তা সরকারের প্রচলিত নীতির কারণে কৃষকদের কাছে না পৌছে বরং ব্যবসায়ী বা অন্য কোন মধ্যসত্ত্বভোগীর কাছে পৌছায়। যদিও বর্তমান সরকার ভর্তুকী দেওয়ার ক্ষেত্রে অতীতের উপরোক্ত নীতিটি পরিবর্তন করে কৃষকরা যাতে প্রত্যক্ষভাবে ভর্তুকী পায় সে পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে, তবুও ব্যবস্থাটি কতটুকু কার্যকর তা এখনও বলার সময় আসেনি।

এটা সত্য যে, এখনও বাংলাদেশের কৃষি মূলতঃ খোরাকি কৃষি (Subsistense Agriculture)। কৃষির সর্বোচ্চ উৎপাদন সম্ভাবনাকে ব্যবহার করার জন্য প্রয়োজনীয় আর্থিক বিনিয়োগ, প্রযুক্তি এবং কৃষকদের সহায়তা করতে পারে এমন নীতি সহায়তা রাষ্ট্রের তরফ থেকে করা হয়নি। যদিও ৬০ এবং ৭০ এর দশকে আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানসমূহ তাদের উদ্ভাবিত বীজ, সার এবং কীটনাশকের বাজার তৈরি

করার জন্য আর্থিক সহায়তা প্রদান করে কিন্তু ৮০র দশক থেকে বর্তমান পর্যন্ত কৃষির ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক সহায়তা একেবারে নেই বললেই চলে। অথচ বাংলাদেশে কৃষির সম্ভাবনার যদি সবটুকু ব্যবহার করা সম্ভব হতো তাহলে বাংলাদেশ হয়ে উঠতে পারতো পৃথিবীর অন্যতম কৃষিপণ্য রপ্তানিকারক দেশ এবং একই সাথে কৃষি থেকে উদ্বৃত্ত গ্রামীণ এলাকায় সেবা ও শিল্প খাতে বিনিয়োজিত হয়ে ব্যাপক কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করতে পারতো। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় রাষ্ট্রীয় অগ্রাধিকার না থাকার কারণে যেমন তৈরী হয়নি কৃষি এবং কৃষক বান্ধব নীতিমালা, তেমনি রয়ে গেছে কৃষিপণ্যের বিপণন দুর্বলতা, প্রয়োজনীয় মূলধন এবং প্রযুক্তির অভাব। তাই বলা যায়, প্রচলিত রাষ্ট্র কাঠামোতে দরিদ্র কৃষকের কোন অংশীদারিত্ব নেই। কাজেই সরকারী ব্যয় বরাদ্দ থেকে দরিদ্র কৃষকদের উপকৃত হওয়ার সম্ভাবনা কখনই উজ্জ্বল ছিলনা।

২.২ সমানুপাতিক কর ব্যবস্থা

বাংলাদেশের কর ব্যবস্থাটি হলো সমানুপাতিক । এই কর ব্যবস্থাটি অন্যায্য এবং তা মোটেই দরিদ্র বান্ধব নয় বরং তা ধনী বান্ধব। এই কর ব্যবস্থায় একদিকে যেমন দরিদ্ররা অধিক পরিমাণ কর দিতে বাধ্য হন তেমনি অন্যদিকে রাষ্ট্রের আনুকূল্যে ধনীরা নানান অজুহাতে কর রেয়াতের মাধ্যমে প্রভূত অর্থনৈতিক সুবিধা ভোগ করে। সরকারের তথ্য বিবরণী থেকে জানা যায়, ২০০৯-২০১০ সালে সর্বোচ্চ আয়কর আসে ২৭ শতাংশ। অর্থাৎ এই ধনীক শ্রেণীরা যারা আয়কর দিয়ে থাকেন তারা দেশের মোট সম্পদের ৮০ ভাগেরই বেশি নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। সেই ধনীক শ্রেণী মাত্র ২৭ শতাংশ কর দিয়েছে। মূলত রাষ্ট্রই তাদের নিম্নহারে কর দেয়ার এই সুযোগ সৃষ্টি করে দিয়েছে। অন্যদিকে দেশের কর ব্যবস্থা সমানুপাতিক হবার কারণে বাকী ৭৩ শতাংশ রাজস্ব সমানুপাতিক হারে সকল নাগরিককে প্রদান করতে হয়। এক্ষেত্রে যাদের আয় কম এবং আয়ের তুলনায় ব্যয় বেশি অর্থাৎ যারা অর্থনৈতিক দিক দিয়ে দূর্বল তারা আয়ের তুলনায় বেশি হারে কর প্রদানে বাধ্য হয়। অন্যদিকে যাদের আয়ের তুলনায় ব্যয় কম সেই ধনীরা সম্পদের মালিকানার তুলনায় কম কর প্রদান করেন। ফলে যেমন ধনী-দরিদ্র্যের বৈষম্য বৃদ্ধি পাচ্ছে তেমনি দরিদ্রদের দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে লড়াই এর সক্ষমতাও হ্রাস পাচ্ছে এবং দারিদ্র্য থেকে তাদের বেরিয়ে আসা সম্ভব হয়ে উঠছে না।

পাশ্চাত্যের উন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলো এমনকি পুঁজিবাদের প্রধান প্রবক্তা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেরও করব্যবস্থা হচ্ছে প্রগতিশীল কর-ব্যবস্থা (Progressive Tax System)। এক্ষেত্রে যে যত বেশি আয় করে সে তত বেশি কর দিয়ে থাকে। দরিদ্ররা রাষ্ট্রীয় উদ্যোগেই কর রেয়াত পেয়ে থাকে, যাতে আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি না হয় এবং তারা দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে লড়াই করতে পারে।

এ থেকে স্পষ্ট যে, আমাদের দেশের সমানুপাতিক কর ব্যবস্থাটি দরিদ্র জনগোষ্ঠীর ওপর অতিরিক্ত চাপ তৈরি করছে এবং অন্যায্যভাবে তাদের নিকট থেকে কর আদায় করছে। অর্থনৈতিক এবং সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে কর ব্যবস্থা এমন হওয়া উচিত যা দরিদ্রদের কোন চাপের মধ্যে ফেলবে না বরং দারিদ্র্য জয়ের সংগ্রামে নিজেদেরকে আরও বেশি সম্পৃক্ত করতে উৎসাহিত করবে।

২.৩ প্রচলিত ব্যাংক ব্যবস্থা

দারিদ্র্যের অন্যতম কারণ হলো প্রচলিত ব্যাংক ব্যবস্থা । তাই প্রচলিত ব্যাংক ব্যবস্থার একটা পর্যালোচনা দরকার। কারণ ব্যাংক ব্যবস্থা থেকে প্রতিবছর যে পরিমাণ অর্থ বিনিয়োজিত হয় তা বাৎসরিক বাজেটের থেকে অনেক বেশি। তাই জানা দরকার, প্রচলিত ব্যাংকিং ব্যবস্থায় কারা, কিভাবে

উপকৃত হচ্ছে এবং কে এই অর্থ ব্যাংকে আমানত হিসেবে গচ্ছিত রাখছে। ২০০৮ এবং ২০০৯ সালে বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রকাশিত Schedule Bank Statistics থেকে জানা যায়, গ্রামীণ এলাকায় বাণিজ্যিক ব্যাংকের শাখার হার শতকরা ৫৭.৫৫ শতাংশ। অন্যদিকে ২০০৮ সালে গ্রামীণ এলাকায় বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর সমষ্টিগত প্রদত্ত ঋণ ৮ শতাংশ এবং ২০০৯ সালে তা হ্রাস পেয়ে ৭.৮০ শতাংশে দাঁড়ায়। অর্থাৎ ২০০৮ এবং ২০০৯ সালে শহর এলাকায় ব্যাংক কর্তৃক বিনিয়োজিত অর্থ বা প্রদত্ত ঋণের পরিমাণ যথাক্রমে ৯২ এবং ৯২.২০ শতাংশ । উপরোক্ত তথ্য পর্যালোচনা করলে একথা স্পষ্টভাবে বলা যায় যে, ব্যাংকের গ্রামীণ শাখাগুলো গ্রাম এলাকা থেকে মূলত: আমানত সংগ্রহ করে এবং তা শহর এলাকায় অতি মুনাফার জন্য বিনিয়োগ করে থাকে। তাই বলা যায়, বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর গ্রামীণ শাখা যা শতকরা ৫৭.৫৫ শতাংশ, তাদের প্রধান কাজ হলো গ্রাম এলাকা থেকে শহর এলাকায় সম্পদ স্থানান্তর করা । মূলত: গ্রামীণ এলাকায় বসবাসকারী মানুষের সংখ্যা জনসংখ্যার প্রায় ৮০ শতাংশ। তাই প্রচলিত ব্যাংক ব্যবস্থার মাধ্যমে কম বিনিয়োগ এবং সম্পদ স্থানান্তরের ফলে গ্রামীণ এলাকার অর্থের প্রবাহ যেমন কম থাকে তেমনি শিল্প কারখানাও স্থাপিত হয় না। ফলে গ্রামীণ এলাকায় নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয় না। তাই বলা যায়, এই প্রচলিত ব্যাংক ব্যবস্থা গ্রামীণ এলাকার দারিদ্র্য ব্যাপকহারে বৃদ্ধিতে সহায়তা করছে। প্রকাশ থাকে যে, শহর এলাকার তুলনায় গ্রামীণ এলাকায় দারিদ্র্যের হার বেশি।

২.৪ গরীব মানুষের সংগঠনের অভাব

দারিদ্র্য দূর করতে হলে সম্ভবত সবার আগে চাই দরিদ্রদের নিজস্ব সংগঠন। এমন সংগঠন চাই যার মাধ্যমে তারা তাদের অধিকার আর রাষ্ট্রীয় ব্যয় বরাদ্দে অংশীদারিত্ব প্রতিষ্ঠা করতে পারবে এবং নিজেদের সমস্যা শনাক্ত করে নিজেরাই এর সমাধানে উদ্যোগী হবে। নিজস্ব সংগঠন বলতে আমরা বুঝি দরিদ্রদের নিজেদের দ্বারা গঠিত ও পরিচালিত সংগঠন। বাংলাদেশে যে ধরণের প্রতিষ্ঠানগুলোর মাধ্যমে বর্তমানে রাষ্ট্রীয় বরাদ্দ ব্যয় হয়ে থাকে তাতে তাদের কোন অংশীদারিত্ব থাকে না। বরং সমাজের বিত্তশালী ও প্রভাবশালীরাই এই ধরণের প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করে থাকেন। সরকারী পৃষ্ঠপোষকতায় পরিচালিত প্রতিষ্ঠানগুলোর মাধ্যমে দরিদ্রদের প্রয়োজনীয়তা বা সমস্যার নিরিখে কার্যকর প্রস্তাবনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন সম্ভবপর হয় না। এর একটি উদাহরণ পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়। এই বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে দরিদ্রদের অভিগম্যতা প্রায় শূন্যের কোঠায়। যদিও ব্যয়ের সিংহভাগই জনগণের কাছ থেকে নেয়া করের টাকা। সরকার পরিচালিত যে কোন প্রতিষ্ঠানেই দরিদ্রদের চাহিদা মেটানো এবং দরিদ্রদের পক্ষে লড়াই করার বিষয়টি উপেক্ষিত হয়। কাজেই এমন ধরণের প্রতিষ্ঠান প্রয়োজন যেখানে দরিদ্রদের অভিগম্যতা থাকবে, তাদের সমস্যা, আশা-আকাঙ্খার কথা বলতে পারবে, দাবি রাখতে পারবে। এটা না হলে দারিদ্র্য দূর করা সম্ভবপর হবে না।

২.৫ রাজনৈতিক সিদ্ধান্তহীনতা

বাংলাদেশের দারিদ্র্য অবস্থার প্রধান কারণ দারিদ্র্য নিরসনে রাজনৈতিক সিদ্ধান্তের অভাব। দারিদ্র্য বিমোচন নিয়ে অনেক রাজনৈতিক দলের কিছু বক্তব্য থাকলেও কেউই সুনির্দিষ্ট অঙ্গীকার ব্যক্ত করেনি । প্রতি বছরই বাজেট বক্তব্যে সরকারের অর্থমন্ত্রী বলেন, এটি গরীব মানুষের বাজেট। তবে রাজনৈতিক অঙ্গীকারের দু'টো ঘটনা উল্লেখ করা যায়। কৃষক প্রজা পার্টি ১৯৩৭ সনে মহাজনী ঋণ ও জমিদারী ব্যবস্থা উচ্ছেদের রাজনৈতিক অঙ্গীকার ব্যক্ত করে ক্ষমতায় আসে। দলটির নেতা শের-এ-বাংলা এ, কে,

ফজলুল হক বাংলার মূখ্যমন্ত্রী হয়েই ঋণ শালিসী বোর্ড গঠন এবং মহাজনী প্রথা উচ্ছেদের আইন পাশ করেন। তিনি বিনা ক্ষতিপূরণে জমিদারী প্রথা উচ্ছেদের জন্যে ক্লাউড কমিশন গঠন করেন। কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ইংরেজ শাসকদের পক্ষাবলম্বন না করায় শের-এ-বাংলা মূখ্যমন্ত্রীত্ব হারান। যদিও কমিশন রিপোর্ট দেয় কিন্তু তাঁর মেয়াদকালের মধ্যে তিনি আইন পাশ করতে পারেননি। এভাবে কাজটি অসমাপ্ত থেকে যায়। ১৯৫০ সনে জমিদারী অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ত্ব আইন পাশের মাধ্যমে জমিদারী ব্যবস্থা উচ্ছেদ হয়। তবে এরই ধারাবাহিকতায় ১৯৬৪ সনে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর মৃত্যুর পর আওয়ামী লীগের প্রধান নেতা হিসেবে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের আবির্ভাব ঘটে। বাংলার স্বাধীনতা আন্দোলনের জন্যে আওয়ামী লীগের প্রস্তুতিপর্বে ১৯৬৬ সনে তিনি ৬ দফা ঘোষণা করেন। দলটি ক্রমশঃ দেশের মানুষের আস্থাভাজন হয়ে ওঠে। ছয় দফার ভিত্তিতে গড়ে ওঠে প্রবল জনমত। এর ধারাবাহিকতায় ১৯৬৮-৬৯ এর গণ-আন্দোলন এবং ১৯৭০ এর নির্বাচনে আওয়ামী লীগের একচেটিয়া জনসমর্থন লাভ এবং এরই চূড়ান্ত পরিণতি হলো রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জন। এরকম সুনির্দিষ্ট রাজনৈতিক অঙ্গীকার ছাড়া এদেশের দারিদ্র্য দূর হবে না। অবশ্য, স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ দলটি রাষ্ট্রপতির আদেশে (পিও ৯৮/৭২) ভূমি সংস্কারের কথা বলেছিল। উদ্যোগটি আজও বাস্তবায়িত হয়নি। ২০০৮ সালের নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে দলটির নির্বাচনী ইশতেহারে ভূমিহীনদের জীবনমান উন্নয়নে তাদের মাঝে খাসজমি বন্টনের কথা বলা হয়েছে।

গণতান্ত্রিক বিধি-বিধান অনুযায়ী জনগণের মতামত নিয়ে রাজনৈতিক দলগুলো রাষ্ট্র পরিচালনা করে। চূড়ান্ত অর্থে রাজনৈতিক নেতারাই নীতি-নির্ধারক। একারণে রাজনৈতিক দল ও তার নেতৃবৃন্দ গরীব মানুষের উন্নয়নে যতখানি আন্তরিক ও সচেতন, দরিদ্র জনগণের উন্নয়নও ততখানি হবে এটা প্রত্যাশিত। দারিদ্র্য বিমোচনে রাজনৈতিক অঙ্গীকারের বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ। রাজনৈতিক সিদ্ধান্তহীনতার অভাবে যেমন পরিপূরক নীতিমালা প্রণয়নের কোন সুযোগ নেই, তেমনি নেই দারিদ্র্য পরিস্থিতির উন্নতির কোন সম্ভাবনা।

বাংলাদেশের প্রধান রাজনৈতিক দলগুলো তাদের ইশতেহার-বক্তৃতা-বিবৃতির মাধ্যমে বার বার ঘোষণা করে এবং দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করে যে দারিদ্র্য দূর করাই তাদের প্রধানতম উদ্দেশ্য। কিন্তু বাস্তবে রাষ্ট্র কাঠামো এবং জাতীয়ভাবে গৃহীত সকল কার্যক্রমেই দরিদ্রদেরকে উপেক্ষা করা হয় এবং তাদের সমস্যা নিরসনে বা দারিদ্র্য দূর করার উদ্দেশ্যে জোরালো কোন পদক্ষেপ কখনওই নেয়া হয়নি। যদিও মূলতঃ তারাই করদাতা এবং সংখ্যাগরিষ্ঠ দরিদ্রদের ভোটেই এসব সরকার নির্বাচিত হয়ে আসছে। একথা ঠিক যে দরিদ্রদের ভেতরে দারিদ্র্যকে জয় করার তীব্র আকাঙ্ক্ষা রয়েছে। দরিদ্র শিশুদের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি করা, শিশুমৃত্যুর হার কমানো, শতভাগ স্যানিটেশন অর্জন ইত্যাদি দরিদ্রদের লড়াই-এর ফসল এবং দরিদ্রদের দারিদ্র্য জয়ের সদিচ্ছার বহিঃপ্রকাশ। তাই দারিদ্র্য জয়ের জন্য দরিদ্রদের যদি আরও রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা দেয়া হয় এবং সরকার দৃঢ়প্রত্যয়ী থাকে, তাহলেই দারিদ্র্য দূর করা সম্ভব।

২.৬ *দারিদ্র্য ও ভূমিহীনতার ঐতিহাসিক কারণ*

দীর্ঘ কৃষক আন্দোলন এবং বিশ্বব্যাপী শিল্প বিকাশের স্রোত ভারতবর্ষেও অনুভূত হওয়ার কারণে ১৭৯৩ সালের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ব্যবস্থাকে সংশোধন করতে ১৮৮৫ সালে তৎকালীন বৃটিশ সরকার 'বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইন ১৮৮৫' পাশ করে। ফলাফল বিবেচনায় আইনটি বিতর্কিত হয়েছে। এ আইনের ফলে জমির উপর দখলী কৃষকের মালিকানা স্বত্ব প্রতিষ্ঠা হলেও বাংলায় ভূমিহীনতা শুরু হয় এবং দারিদ্র্য পরিস্থিতি দীর্ঘ হয়।

তৎকালীন প্রেক্ষাপট বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় দুটি প্রধান বিষয় এ আইন পাশের পিছনে ভূমিকা রেখেছিল। প্রথমটি হচ্ছে নীলকরদের অত্যাচার ও কৃষক বিদ্রোহের বিষয়টিকে মীমাংসা করা এবং অপরটি হচ্ছে শিল্প বিকাশের জন্য জমি হস্তান্তরের সুযোগ সৃষ্টি করা।

আমরা জানি যে, ১৭৬৫ সালে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি মোঘল সম্রাটের নিকট থেকে বাংলার দেওয়ানী লাভের মাধ্যমে রাজস্ব আদায়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত হয়। তাদের সীমাহীন অত্যাচারের শিকার হয়ে ১৭৬৯ সালে (বাংলা ১১৭৬) ইতিহাসের সবচেয়ে ভয়ংকরতম দূর্ভিক্ষ হয়, যা ছিয়াত্তরের মনন্তর নামে খ্যাত। বাংলার এক তৃতীয়াংশ মানুষ এ দূর্ভিক্ষে প্রাণ হারায়। কোম্পানী মূলতঃ নিপীড়নমূলক রাজস্ব ব্যবস্থা গড়ে তোলে। জমির খাজনা আদায়ে কোম্পানী একশালা বন্দোবস্ত কার্যক্রমের পরিবর্তে ১৭৭২ সালে পাঁচশালা বন্দোবস্ত চালু করে। এরপর দশশালা বন্দোবস্ত কার্যক্রম এবং তৎপরবর্তীতে লর্ড কর্ণওয়ালিশ ১৭৯৩ সালে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ব্যবস্থা প্রবর্তন করার মাধ্যমে কৃষকের হাত থেকে জমির অধিকারকে চিরতরে ছিনিয়ে নিয়ে জমিদার শ্রেণীর হাতে জমির মালিকানা তুলে দেয়। এর মাধ্যমে ঔপনিবেশিক শক্তির বিত্ত-বৈভব বাড়াতে এবং একই সাথে কৃষক-প্রজা বিদ্রোহ কমাতে একটি নতুন শ্রেণী তৈরি করা হয় যাদেরকে সামনে রেখে ইংরেজরা প্রত্যক্ষভাবে প্রজা বিদ্রোহের হাত থেকে নিস্কৃতি পায় এবং নির্বিঘ্নে আরো বেশি রাজস্ব আদায় করতে সমর্থ হয়। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে কৃষক শুধু জমির উপর তার জন্ম-জন্মান্তরের অধিকারই হারায়নি, সেই সাথে জমিতে পছন্দসই শস্য ফলানোর অধিকারও হারায়। নীলকর সাহেবরা কৃষকদেরকে দাদনের বিনিময়ে ধানের পরিবর্তে নীলচাষে বাধ্য করে। উনবিংশ শতাব্দির দীর্ঘসময় ধরে কৃষকরা নীলকর সাহেবদের বিরুদ্ধে লড়াই সংগ্রাম করেছে। ইউরোপে রাসায়নিক নীলের আবিষ্কারের পর এ ঘটনা স্তিমিত হলেও সারা ভারতবর্ষ জুড়ে নীলকর ও জমিদারদের বিরুদ্ধে অসংখ্য কৃষক-বিদ্রোহ সংগঠিত হয়েছে। ১৮৮৫ সালে ইংরেজ সরকার বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ত্ব আইন পাশ করার মাধ্যমে ১৭৯৩ সালে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে জমিতে কৃষক প্রজার যে অধিকারকে হরণ করা হয়েছিল তার সামান্য অংশ ফিরিয়ে দেয়, বিশেষ করে কৃষক-প্রজার ভোগ দখলকৃত জমিতে ইচ্ছাধীন ফসল ফলানোর অধিকার জন্মায়। এ আইনের আনুষ্ঠানিক উদ্দেশ্য যেভাবে ব্যাখ্যায়িত করা হয় তা হল-

ক. ৩ থেকে ১২ বছর মেয়াদী রায়তের অধিকার ও নিরাপত্তা বিধান করা
খ. উৎপন্ন ফসলের ন্যায্য অংশ জমিদারকে দেয়া এবং
গ. জমিদার ও রায়তের মধ্যকার বিরোধীয় সকল বিষয়ের নিস্পত্তির জন্য বিস্তারিত নিয়ম বা বিধি রচনা করা।

এই আইন পাশের মাধ্যমে সারা বাংলায় জরিপ কার্যক্রম পরিচালনা করা হয় যা সিএস নামে পরিচিত। এ আইনের মাধ্যমে জোতদার ও অধীনস্ত জোতদার এবং রায়ত ও অধীনস্ত রায়তদের জমির ব্যবহারিক মালিক হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া হয়। রায়ত বা কৃষক প্রজাকে তিন শ্রেণীতে এবং অধীনস্ত রায়তকে আরো তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়। এ আইনের উল্লেখযোগ্য বিষয় হচ্ছে ১২ বছর জমিতে বসে থাকলে প্রজা হিসেবে স্বীকৃতি এবং প্রজাদের ইচ্ছাধীন জমি হস্তান্তরের সুযোগ দেয়া।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত পদ্ধতি চালু থেকে ১৮৮৫ সালের আইন পাশ হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত জমিদাররা তাকেই জমিতে ভোগদখল করতে দিত যারা কৃষি উৎপাদনে ভূমিকা রাখতে পারবে। যদিও উৎপাদিত ফসল হতে উচ্চহারে খাজনা পরিশোধ করতে হত, তারপরও গরীব কৃষকরাই জমি ব্যবহারের সুযোগ পেত। অন্য কথায় জমির উপর সত্যিকার কৃষকের ব্যবহারিক নিয়ন্ত্রণ ছিল। ১৮৮৫ সালের আইনের

ফলে দীর্ঘসময়ের বঞ্চনা, শোষণ ও নির্যাতনের যাঁতাকলে পিষ্ট কৃষকের অর্থনৈতিক মেরুদন্ডও সম্পূর্ণরূপে ভেঙে গিয়েছিল, এ অবস্থায় জমিটি ধরে রাখার সামর্থ্য তাদের বেশিরভাগেরই ছিলনা, ফলে তারা তাদের বসতি ও কৃষিজমি হাতছাড়া করে বা বাধ্য হয়ে ভূস্বামীদের কাছে হস্তান্তর করে। কৃষকরা অশিক্ষা ও অজ্ঞানতার মধ্যে দিনাতিপাত করছিল, রাষ্ট্র তাদেরকে কখনো কোনদিন কোন আনুকুল্য বা পৃষ্ঠপোষকতা দেয়নি, এমনকি কোন দুর্যোগে ফসল ক্ষতিগ্রস্ত হলেও তার কোন ক্ষতিপূরণও দেয়নি। এ আইন পাশের পর রাষ্ট্র কৃষকের জমিটি ধরে রাখতে কোন উদ্যোগ গ্রহণ করেনি বরং জমি যাতে কৃষকের হাত থেকে ভূমি মালিকের হাতে চলে যায় তার সকল আয়োজন করেছিল। ফলে অসংখ্য কৃষক-প্রজা বা রায়ত জমি হারিয়ে ভূমিহীন হয়ে পড়ে।

অপরদিকে এসময় বাষ্পীয় ইঞ্জিনের আবিষ্কার হয়েছে, সারা পৃথিবীজুড়ে শিল্প-কারখানা গড়ে উঠছে। ইউরোপের শিল্প বিপ্লবের হাওয়া ভারতবর্ষেও পড়তে থাকে। শিল্প ও পুঁজির বিকাশে ইংরেজরা এদেশে ব্যক্তি মালিকানায় রেল লাইন, শিল্প কারখানা স্থাপন ও পুঁজিপতি ব্যবসায়ীদের ব্যবসা সম্প্রসারণের উদ্যোগ নেয়। নব্য শিল্পপতিদের স্বার্থ রক্ষায় ব্যাপক পরিমাণ কৃষি জমি অধিগ্রহণ ও অর্জনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। এ আইনের মাধ্যমে জমি হস্তান্তরের বৈধ সুযোগ সৃষ্টি হওয়ার কারণে নিরাপত্তাহীনতা, অভাব ও ঋণগ্রস্ত কৃষক অর্থের প্রয়োজনে বা জোতদার ও প্রভাবশালীদের চাপে জমি হস্তান্তরে বাধ্য হয় । এর ফলে লক্ষ লক্ষ কৃষিজীবী মানুষ জমি থেকে উচ্ছেদ হয়ে চিরতরে নি:স্ব ভূমিহীনে পরিণত হয়।

১৮৮৫ সালের বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইন পাশের মাধ্যমে তাই একদিকে বড়-বড় বৈধ ভূস্বামী সৃষ্টি হয় আর অপরদিকে কৃষকের দারিদ্র্য চরম আকার ধারণ করে। এর ফলে গ্রামীণ কৃষির সাথে যুক্ত মানুষরাই মূলতঃ ভূমিহীন হয়ে পড়ে। এ ভূমিহীনরা জমি বসতভিটা হারিয়ে কাজের সন্ধানে উদ্বাস্তু হয়ে শহরে ভিড় করতে থাকে। আজকের নগর দারিদ্র্য তাই গ্রামীণ দারিদ্র্যেরই আর একটি রূপ। ভূমি কেন্দ্রিক আমাদের এ সমাজ ব্যবস্থায় ভূমিহীনতা আর দারিদ্র্যের কারণ আলাদা কোন বিষয় নয়। কৃষকের ভূমিহীনতাই তাকে দরিদ্র থেকে অতি-দরিদ্র অবস্থায় নিপতিত করেছে। এভাবে দারিদ্র্যের যে বিষবৃক্ষ দীর্ঘ সময় ধরে বেড়ে উঠেছে তা শিকড়সহ উপড়ে ফেলার উদ্যোগহীনতা অদ্যাবধি দৃশ্যমান।

৩. বাংলাদেশের দারিদ্র্য বিমোচনে গৃহীত সরকারি ও বেসরকারি প্রচেষ্টা

দারিদ্র্য বিমোচনে সরকারি ও বেসরকারি নানা উদ্যোগের কথা শোনা যায়। বলা হয়, আমাদের দারিদ্র্য পরিস্থিতির উন্নতি ঘটছে। তবে এ লক্ষ্যে এ যাবত তেমন কোন জোরালো উদ্যোগ নেয়া হয়েছে বলে আমাদের জানা নেই।

উনিশ শতকের শুরুর দিকে আজকের বাংলাদেশে গ্রামীণ দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে 'গ্রাম উন্নয়ন' নীতিমালা গৃহীত হয়। এর আওতায় 'রুরাল রিকন্সট্রাকশান' নামে গ্রামোন্নয়নের বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালিত হয়। পঞ্চাশের দশকে উন্নয়ন কৌশল হিসেবে গৃহীত হয় যথাক্রমে 'আধুনিকায়ন তত্ত্ব' আর 'সবুজ বিপ্লব'কর্মসূচী। এরপর আসে 'চুইয়ে পড়া অর্থনীতির তত্ত্ব' (Trickle down theory)। এতে বলা হয়, দরিদ্র দেশগুলোর মূল সমস্যা হচ্ছে প্রয়োজনীয় মূলধন না থাকা। ফলে পর্যাপ্ত মূলধনের জোগান দিতে পারলেই দেশের উন্নয়ন ঘটবে। আর সেই উন্নয়নের ঢেউ গ্রামে সঞ্চারিত হয়ে গ্রামীণ দারিদ্র্য কমিয়ে আনবে। এই পদ্ধতিতে গ্রামীণ দারিদ্র্যের হেরফের না ঘটলেও রাষ্ট্রীয় কাঠামো ও প্রশাসনিক

কাঠামোর নানা স্তরে থাকা লোকদের ব্যাপক আর্থিক উন্নয়ন ঘটে। অভিজ্ঞতায় দেখা যায় যে, কার্যকর অর্থবহ উন্নয়নের জন্য চাই উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় উদ্দিষ্ট জনগোষ্ঠীর সম্পৃক্তি ও সরাসরি সক্রিয় অংশগ্রহণ। গেল ক'দশক হয় গ্রামীণ দারিদ্র্য বিমোচনের জন্যে উন্নয়নতত্ত্ববিদ, অর্থনীতিবিদ, সমাজবিজ্ঞানীরা অংশগ্রহণ (Participation), ক্ষমতায়ন (Empowerment) সচেতনায়ন (Conscientization) ইত্যাদি ধারণার কথা বলেছেন।

৩.১ সরকারি প্রচেষ্টা

সরকারি প্রচেষ্টা হিসেবে অন্যতম প্রধান হলো সামাজিক নিরাপত্তামূলক কার্যক্রম। এটা সেফটিনেট প্রোগ্রাম হিসেবে পরিচিত। এই সেফটিনেট কার্যক্রমের আওতায় সরকার বয়স্ক ভাতা, বিধবা ভাতা, ভিজিএফ, ভিজিডি ইত্যাদির মাধ্যমে দরিদ্রদের কিছু অর্থ সহায়তা দেয়। এসব কাজ জাতীয় বাজেট অনুযায়ী বাস্তবায়িত হয়। বেশকিছু হতদরিদ্র বা প্রান্তিক মানুষ সরাসরি অর্থ সহায়তা পান, অতি ক্ষুদ্র বলয়ে হলেও একটি নিরাপত্তা বেষ্টনী তৈরি হয়। এই ধরণের সহায়তা মানুষের কতটা উপকারে আসে, তা নিয়ে অবশ্য বিতর্ক আছে। জোর দিয়ে বলা যাবে না কর্মসূচিটি দারিদ্র্য দূরীকরণের উদ্দেশ্যে প্রণীত। এটাকে অনেকেই এক ধরণের ত্রাণ কার্যক্রম বলে বিবেচনা করেন। দরিদ্রদের জন্যে সরকারের পরিচিত সাধারণ কার্যক্রমটি হচ্ছে ভিজিএফ, ভিজিডি। এই কার্যক্রমে হতদরিদ্র মানুষ চিহ্নিত করে তাদেরকে কার্ডের মাধ্যমে চাল বা গম বিতরণ করা হয়। সাধারণত ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যানরা হতদরিদ্র মানুষদের চিহ্নিত করেন। এ কর্মসূচি বিশেষ দূর্যোগ পরিস্থিতির ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। এটাই হতদরিদ্র ও দরিদ্রদের জন্য রাষ্ট্রের প্রধান কর্মসূচি। এই কর্মসূচির জন্য সরকারের মোট ব্যয় বরাদ্দের ৭.৩০% রাখা হয়েছে ২০০৯ সনে। অথচ দরিদ্র মানুষের সংখ্যা হলো মোট জনসংখ্যার ৪০%। পরিসংখ্যানই বলে এই বরাদ্দ হতদরিদ্র মানুষের সংখ্যাধিক্যের বিচারে খুবই নগণ্য। বলাই বাহুল্য, দরিদ্রদের তুলনায় ধনীদের জন্য রাষ্ট্রের ব্যয় বরাদ্দ অনেক অনেক বেশি ।

৩.২ বেসরকারি প্রচেষ্টা

সরকারের পাশাপাশি বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থাসমূহ নানাবিধ দারিদ্র্য বিমোচনের কর্মসূচি নিয়ে থাকে। সচেতনতা বৃদ্ধির কার্যক্রমের পাশাপাশি দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মধ্যে ক্ষুদ্রঋণ প্রদান এর মধ্যে অন্যতম। তবে ক্ষুদ্র ঋণের কার্যকারিতা নিয়ে ইতোমধ্যে যথেষ্ঠ প্রশ্ন উঠেছে। এ পর্যন্ত এর উল্লেখযোগ্য সফলতার কোন উদাহরণ তৈরি হয়নি। যদিও ক্ষুদ্র ঋণ বিতরণকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে গ্রামীণ ব্যাংক এবং এর উদ্যোক্তা অধ্যাপক ডঃ ইউনুস নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন। তবে এটা সত্যি যে, ক্ষুদ্রঋণ দরিদ্রদের আনুষ্ঠানিক অর্থনৈতিক সেক্টরে অভিগম্যতা সৃষ্টি করেছে যা পূর্বে অপেক্ষাকৃত কঠিন ছিল।

আমাদের দেশে অতীতেও দরিদ্রদের মধ্যে ধনীদের ঋণের ব্যবসা ছিল। এমনকি এই ব্যবসা কাবুলিওয়ালাদেরও ছিল। তবে ঋণ ব্যবসার উদ্দেশ্য ছিল টাকা খাটিয়ে টাকা বানানো। ইংরেজ আমলে নীল চাষের উদ্যোক্তারা চাষীদের নগদ টাকা ধার বা দাদন দিয়ে নীল চাষে উদ্বুদ্ধ করতো। ইংরেজ শাসন অবসানের বহুবছর পরও গ্রামীণ মহাজন কর্তৃক টাকা দাদন দেয়া অব্যাহত আছে। বিত্তহীন ও নিম্নবিত্ত উৎপাদক কৃষকদের মধ্যে উচ্চ সুদে এখনও চলছে দাদন ব্যবসা যার ফলস্বরুপ কৃষকরা আষ্ঠেপৃষ্ঠে বাঁধা পড়ে যাচ্ছে মহাজনী ঋণজালের দুর্ভেদ্য দুষ্টচক্রে। এই মহাজনী ঋণ চক্রজাল থেকে গ্রামের গরীবদের মুক্তির কথা বলেই এদেশে শুরু হয় ক্ষুদ্র ঋণের যাত্রা ।

গ্রামীণ ব্যাংক ধারার ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচি চালু হওয়ার প্রথম পর্যায়ে এর সফলতা ছিল আশাব্যাঞ্জক। এই কর্মসূচির আওতায় আধা একর (৫০ শতক) বা এর কম পরিমাণ জমির মালিকদের টার্গেট করে গ্রুপ গড়ে তুলে তাদেরকে ঋণ দেয়া হয়। প্রথম দিকে ঋণ ফেরত দেয়ার হার ছিল ৯৮%। নতুন অঞ্চলে কর্মসূচির বিস্তার ঘটলেও এই হার বজায় থাকতো। ক্রমান্বয়ে সব এনজিও এটি অনুসরণ করতে থাকে। এর বিস্তৃতিও ঘটে দেশজুড়ে। বর্তমানে দেশের অধিকাংশ গ্রামে বেসরকারি সংস্থা পরিচালিত ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। এছাড়াও আছে সরকারি মালিকানাধীন কর্ম-সংস্থান ব্যাংক। এই ব্যাংকটি এনজিওদের মত করেই ঋণ কার্যক্রম পরিচালনা করে।

ক্ষুদ্র ঋণের একটা বড় সমালোচনা হলো এর ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি। ঋণ আদায়ের জন্য সাপ্তাহিক কিস্তি, সুদের হার ইত্যাদির কারণে হতদরিদ্ররা ক্ষুদ্র ঋণ থেকে তেমন উপকৃত হয় না। তাছাড়া এ ঋণ সমাজের ১৮%-১৯% হতদরিদ্র মানুষের কাছে পৌঁছোয় না। যদিও এই ক্ষুদ্রঋণকে অনেকেই দেখেন এবং দেখান দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য আশীর্বাদ হিসেবে তবে উৎপাদনের উপকরণের উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা এবং দীর্ঘমেয়াদী কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচি তেমন সফল হতে পারেনি।

১৯৯৭ সনে সিপিডি আয়োজিত 'বাংলাদেশের উন্নয়নঃ দারিদ্র্য দূরীকরণের রাজনীতি' বিষয়ক আলোচনায় অর্থনীতিবিদ ডঃ বিনায়ক সেন বলেন, "বিভিন্ন মূল্যায়নে ইতিমধ্যে দেখা গেছে যে, ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচী এর সদস্যদের জন্য উপকারী। তুলনার পদ্ধতি পূর্ব বনাম পর, প্রকল্প বনাম কন্ট্রোল গ্রুপের তুলনা, জরিপের বছর, জরিপের এলাকা এবং উপাত্ত সংগ্রহের পদ্ধতি -বিভিন্ন গবেষণায় এসব দিক দিয়ে তারতম্য যাই থাকুক না কেন, ক্ষুদ্র-ঋণ কর্মসূচি যে এর ঋণ গ্রহীতাদের উপকারে এসেছে এটি বারে বারেই প্রমাণিত হয়েছে। তবে আয়, ব্যয়, পরিসম্পদ, কর্মসংস্থান ইত্যাদির নিরিখে কর্মসূচিজনিত অর্থনৈতিক প্রভাবের 'মাত্রা' বেশী নয়। অর্থনৈতিক লাভের চেয়ে এসব কর্মসূচির সামাজিক প্রভাব/ফলাফল বরং অনেক বেশী (এর মধ্যে পড়ে তথাকথিত অ-অর্থনৈতিক মাত্রাসমূহ যথা সচেতনতা, ক্ষমতায়ন, প্রাথমিক শিক্ষা ইত্যাদি)। প্রায়শঃ দাবি করা হয় যে, ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচির আওতাধীন সদস্যদের 'এক তৃতীয়াংশ' দারিদ্র্য সীমারেখা অতিক্রম করেছে এবং 'অন্য এক তৃতীয়াংশ' দারিদ্র্য সীমারেখা অতিক্রম করার কাছাকাছি অবস্থায় পৌঁছেছে। অবস্থার উন্নতি হচ্ছে এ নিয়ে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই, কিন্তু যতোটা দাবি করা হয় বাংলাদেশের বাস্তব অভিজ্ঞতা তাকে সমর্থন করে না। গ্রামীণ ব্যাংক মডেলের মাধ্যমে চিন্তা এবং কর্মে নতুন গতিশীলতা সৃষ্টি হয়েছিল, কিন্তু কালের আবর্তে তা ক্রমশঃ ম্রিয়মান"। (*পৃং নং ১১৯; বাংলাদেশ উন্নয়ন পর্যালোচনা ১৯৯৭ দারিদ্র্য দূরীকরণের রাজনীতি পৃং ১০৫ - ১২৬*)।

ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচির আরো কিছু সীমাবদ্ধতা আছে যা দারিদ্র্য বিমোচনে এর সফলতাকে অনেকখানি স্থান করে দিয়েছে। এর অন্যতম কারণ হচ্ছেঃ

- ❒ হতদরিদ্ররা ক্ষুদ্র-ঋণ পায় না।
- ❒ যারা দারিদ্র্যসীমার বিচারে হয়ত দরিদ্র নয়, কিন্তু যাদের অবস্থাও নাজুক, তারা এই ঋণ কর্মসূচির আওতায় আসেনি।
- ❒ ঋণ পরিশোধের হার কমে যাওয়া।
- ❒ এক সংস্থা/এনজিওর ঋণ পরিশোধের জন্য আরেকটি এনজিও থেকে ঋণ নেয়ার হার বা প্রবণতা বৃদ্ধি।
- ❒ ক্ষুদ্র-ঋণে যেহেতু মুনাফা বা আয়ের পরিমাণ কম সেকারণে অ-কৃষিতে আত্ম-কর্মসংস্থানমূলক প্রকল্পগুলোর শেষাবধি কর্মসংস্থানের প্রধান উৎস হিসেবে আবির্ভূত হতে না পারা।

১৯৯৭ সনে বিশ্লেষিত এই পরিস্থিতির ১৩ বছর পর ২০১০ সনেও এটা খুবই প্রাসঙ্গিক। অবশ্য ক্ষুদ্র ঋণের পরিধি, গ্রহীতা সংখ্যা এবং টাকার পরিমাণ বহুগুণ বেড়েছে। এছাড়াও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে এটি আরও গ্রহণযোগ্য হিসেবে আলোচিত হয়েছে। ক্ষুদ্রঋণ সম্পদহীন দরিদ্র মানুষের কাছে পুঁজি গড়ে তোলার একটি ভালো কৌশল হিসেবে বিবেচিত হয়েছে। বলা যায়, ব্যাপক আলোচিত এই ক্ষুদ্র-ঋণ কার্যক্রম দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য অন্যতম মাধ্যম হতেই পারে, কিন্তু একমাত্র মাধ্যম অবশ্যই নয়। এই ব্যবস্থার মাধ্যমে দরিদ্ররা টিকে থাকবার মত একটি সুযোগ তৈরি করতে পারছে, কিন্তু বেশিরভাগ ক্ষেত্রে পুঁজি বা সম্পদ গড়ে তুলতে পারছে না।

বলাইবাহুল্য, পুঁজি বা সম্পদ গড়ে তুলতে না পারলে কেউ স্বাবলম্বী হতে পারেনা, দারিদ্র্যের দুষ্ট চক্র থেকে বেরুতে পারেনা। একারণে তাদেরকে আরও নানা ধরণের উন্নয়ন সহায়তা দিতে হবে যার অন্যতম হতে পারে উৎপাদনে সহায়ক সম্পদে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় নীতি নির্ধারণ করা এবং প্রাতিষ্ঠানিক ও সাংগঠনিক সহায়তা প্রদান করা। ভূমিহীনদের মধ্যে সরকারি খাসজমি বিতরণ এরকমই একটি বিকল্প উদ্যোগ যা একদিকে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধিতে সাহায্য করবে, অন্যদিকে গরীব ও নিঃস্ব মানুষের স্থিতিশীল বহুমূখী আয়ের সুযোগ করে দেবে।

দীর্ঘদিন ধরে বাংলাদেশে দারিদ্র্য দূরীকরণের বিভিন্ন কৌশল বাস্তবায়ন এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে এ সমস্ত কৌশলের ব্যর্থতার প্রেক্ষিতে এবং উল্লিখিত অভিজ্ঞতার আলোকে একথা দৃঢ়ভাবে বলা যায় যে, দারিদ্র্য দূর করতে হলে সবার আগে চাই দরিদ্রদের হাতে উৎপাদনের উপকরণ হিসাবে সম্পদের মালিকানা। তাদের এই সম্পদের মালিকানা ছাড়া এবং সেই সম্পদ দ্বারা নতুন সম্পদ তৈরি ও দীর্ঘমেয়াদী ও স্থিতিশীল কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা ছাড়া দারিদ্র্য দূর করা সম্ভব নয়। বর্তমান সরকারের হাতে প্রচুর খাসজমি আছে এবং এই খাসজমিই হতে পারে গ্রামীণ দারিদ্র্য দূরীকরণের সবচেয়ে বড় হাতিয়ার। নিচে বিভাগভিত্তিক খাসজমি এবং খাস জলার একটি তুলনামূলক চিত্র তুলে ধরা হল-

বিভাগ	কৃষি খাসজমি (একর)	অকৃষি খাসজমি (একর)	খাসজলা		বাংলাদেশে মোট খাসজমি এবং খাসজলার পরিমাণ (একর)
			আবদ্ধ (একর)	উন্মুক্ত (একর)	
বাংলাদেশ	৮,০৩,৩০৮.৮০	১৬,৮৬,৩৫৪.০০	৩,৪৫,৭৩৬.০০	৪,৮৪,৬১৯.৩৮	৩৩,২০,০১৭.৫০
ঢাকা	২০৭১৩৫.৯৭	৬২২৮২.০০	১৭১৪৬.৫৩	১১০৮০১.১৫	৩৯৭৩৬৫.৬৫
চট্টগ্রাম	১৫৬৭৩৪.৩১	১৩৩৯১১৫.৪৩	১১২৭৯.৪৮	৩১৪২৯.১৩	১৫৩৮৫৫৮.২০০
সিলেট	১২৯৭৬৪.১২	১২০৪৯১.৮২	৭২৭৪৬.৯৪	২৬১৯৬.৪৯	৩৪৯১৯৯.৩৭
রাজশাহী	১৩৬০০৭.৯৬	১২৫৯৪৫.৭২	২১২৩২১.৫৩	৭১৭২৭.৪৫	৫৭৩০০২.৬৬
খুলনা	৫১৭১৪.০১	৩৬৭২৮.০৪	২৭৪০৭.০০	৩৩৬২৬.৪৯	১৪৯৪৭৫.৫৪
বরিশাল	৯৪৯৫২.৪৫	১৭৯০.৯২	৪৮৩৪.৩৩	২১০৮৩৮.৬৭	৩১২৪১৬.৩৭

[উৎস: খাসজমির রাজনৈতিক অর্থনীতি- আবুল বারাকাত] ;

তবে এখানে প্রদর্শিত খাসজমি-জলাই সব নয়। আরো অনেক বেশি খাসজমি-জলা আছে বলে গবেষকরা দাবী করেন। ভূমি মন্ত্রণালয়ের বাইরে অন্যান্য মন্ত্রণালয়, দপ্তর, অধিদপ্তর ইত্যাদির আওতায়ই আছে আরো কয়েক হাজার একর খাসজমি-জলা। এক হিসাবে দেখা গিয়েছে যে, বিদ্যমান ৮,০৩,৩০৮.৮০ একর কৃষি খাস জমি, ১৬,৮৬,৩৫৪.০০ একর অকৃষি খাস জমি এবং ৮,৩০,৩৫৫.৩৮ একর বদ্ধ ও উন্মুক্ত জলাশয় সুষমভাবে বন্টন করা গেলে প্রতিটি ভূমিহীন পরিবার

১.৫২ একর করে খাসজমি (০.৩৭ একর কৃষি খাস জমি + ০.৭৭ একর অকৃষি খাসজমি + ০.৩৮ একর খাসজলাশয় = ১.৫২ একর) পেতে পারে। ভূমিহীনদের মাঝে খাসজমি-জলা বন্টন নিশ্চিতভাবেই গ্রামীণ দারিদ্র্য বিমোচনে অবদান রাখবে। ভূমিহীন পরিবারের সংখ্যা ক্রমেই বাড়ছে। তবুও প্রত্যেক ভূমিহীন পরিবারকে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ খাসজমি দেয়া যেতে পারে।

উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, খুলনা বিভাগ অর্থাৎ দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে খাসজমি আছে ১৪৯৪৭৫.৫৪ একর যা দেশের মোট খাসজমির ৪.৫০%। খাসজমি পাওয়ার উপযুক্ত ভূমিহীন পরিবারের সংখ্যা ৪ লক্ষ ৩ হাজার যা দেশের মোট ভূমিহীন পরিবারের ৯%। প্রতিটি পরিবারকে ০.৩৭ একর করে খাসজমি দেয়া যায়। এটা করা গেলে বিদ্যমান বাজার মূল্যানুযায়ী তার দাম দাঁড়ায় তের হাজার চারশত বাহান্ন কোটি টাকা। ভূমিহীন পরিবারপ্রতি প্রাপ্ত ভূসম্পত্তির দাম দাঁড়ায় ৩ লক্ষ ৩৩ হাজার টাকা। এটা প্রমাণিত যে, সরকারের সাথে বেসরকারী উদ্যোগগুলির সমন্বয় হলে এ সম্পদ হস্তান্তর কর্মসূচি সফল ও আরো গতিশীল হয়ে উঠবে।

দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলের দরিদ্র, ভূমিহীন মানুষদের অংশগ্রহণে এই বিকল্প উদ্যোগ নিয়ে কাজ করা সংস্থা সমূহের মধ্যে অন্যতম হচ্ছে উত্তরণ। উত্তরণ বিশ্বাস করে জমির উপর কৃষকের অধিকার স্বতঃসিদ্ধ। কিন্তু তারা এই সম্পদ হারিয়েছেন, সেই সাথে হারিয়েছেন তাদের ঐতিহাসিক জীবিকার উৎস। খাসজমি পেলে তারা মূলতঃ ফিরে পাবেন তাদের জীবিকার উৎস, পূর্ণ হবে তাদের জীবনধারণের পূর্বশর্ত আর উপলব্ধি করবেন, অনুভব করবেন এক ধরনের নিরাপত্তাবোধ, যে বোধ তাদের শক্তি যোগাবে মানসম্মত জীবন গড়ার লড়াইয়ে। তারা পুর্নবাসিত হবেন উৎপাদক হিসেবে, স্বত্ত্বাধিকারী হিসেবে। এ লক্ষ্যকে সামনে নিয়ে উত্তরণ সমাজের ভূমিহীন দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে মূলত: পুঁজি, কর্মসংস্থান, দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ, উৎপাদিত পণ্য বিপননে সহায়তা আর আইনগত সহায়তা দিয়ে থাকে। সাংগঠনিক আর প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন সহায়তা প্রদানও উত্তরণের কর্মসূচির অন্যতম অংশ।

৩.৩ *খাস জমি বন্টনে উত্তরণের ভূমিকা*

ভূমি হচ্ছে কোন ব্যক্তির অর্থনৈতিক অবস্থা, সামাজিক অবস্থা এবং রাজনৈতিক শক্তির নির্ধারক। এটা বাংলাদেশের মতো কৃষিভিত্তিক সমাজের জন্য আরো সত্য। প্রযুক্তির বা আধুনিকায়নের পরেও ভূমির এই কেন্দ্র অবস্থান স্পর্শাতীত বা অনড়। এই প্রেক্ষাপটে ভূমিহীন কৃষকরা যাতে দারিদ্র্য জয় করতে পারে এবং উৎপাদনশীল উপকরণের মালিকানা পেতে পারে তার জন্য উত্তরণ সরকারের উদ্যোগকে সফল করতে দীর্ঘদিন যাবত কাজ করছে।

উত্তরণ যে প্রক্রিয়ায় ভূমিহীন কৃষকদের সহায়তা করে তা নিম্নরূপ:

১) ভূমিহীন কৃষকদের সংগঠন গড়ে তোলা এবং প্রশিক্ষণ, ওয়ার্কশপ ও দলীয় আলোচনার মাধ্যমে তাদের নেতৃত্বের বিকাশ ঘটানো ও সচেতন করে তোলা।

২) ভূমিহীন সংগঠনগুলোর সমন্বয়ে ইউনিয়ন ও উপজেলা পর্যায়ে ফেডারেশন তথা বৃহত্তর সংগঠন গড়ে তোলা। এই সংগঠনের মাধ্যমে স্থানীয় ইউনিয়ন, উপজেলা ও জেলা পর্যায়ে খাসজমিতে ভূমিহীনরা যাতে তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে দেনদরবার, আলোচনা, মিছিল, মিটিং, সভা ও সমাবেশের মাধ্যমে চাপ সৃষ্টি করতে পারে তার জন্য তাদের সক্ষম করে তোলা।

৩) ৩) ভূমিহীনদের পাশাপাশি সমাজের বিবেকবান ব্যক্তিবর্গ বিশেষ করে উকিল, শিক্ষক, সাংবাদিক, জনদরদী রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গকে নিয়ে জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে পৃথক সংগঠন গড়ে তোলা। এই কমিটির মূল লক্ষ্যই খাসজমিতে ভূমিহীনদের অধিকার প্রতিষ্ঠা ও সরকারের ভূমি সংক্রান্ত আইন যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করার জন্য স্থানীয় ও জাতীয় প্রশাসন ও রাজনৈতিক কর্তৃপক্ষের সাথে দেন দরবার করা।

৪) খাসজমিতে ভূমিহীনরা যাতে তাদের অধিকার বা দখলদারিত্ব বজায় রাখতে পারে সে লক্ষ্যে খাসজমি সংক্রান্ত কোন জটিলতার উদ্ভব হলে আইনি সহায়তা প্রদান করা।

৫) যেসমস্ত ভূমিহীন খাসজমি পেয়েছে তারা যেন তাদের প্রাপ্ত জমি উৎপাদনমূলক কাজে ভালভাবে ব্যবহার করতে পারে তার জন্য ভূমিহীন কৃষকদের আর্থিক ও কারিগরি সহায়তা প্রদান করা।

৬) সংবাদ মাধ্যমে খাসজমি ও ভূমিহীন কৃষকদের সমস্যাবলী যাতে যথাযথভাবে উপস্থাপিত হতে পারে তার জন্য সংবাদকর্মীদের দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম পরিচালনা করা।

৭) ভূমিহীনরা যাতে খাসজমির উপর তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত করতে পারে তার জন্য সমমনা সংগঠনগুলোর সাথে স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ে নেটওয়ার্ক গড়ে তোলা।

খাসজমি বন্টনে উত্তরণের সফলতার কিছু দৃষ্টান্ত নিচে তুলে ধরা হলো।

৪. *দারিদ্র্য জয়ের কৌশল হিসেবে রাষ্ট্রীয় সম্পদ হস্তান্তর- কিছু সাফল্যগাঁথা*

যুদ্ধ করে এক একর জমির মালিক হয়েছে রহিম

ভাগ্য রহিমকে বাবুরাবাদে টেনে এনেছে। ভাগ্যের সাথে যুদ্ধ আর প্রভাবশালী ভূমিদস্যুদের সাথে সংগ্রাম করে আজ সে বাবুরাবাদ গ্রামে এক একর জমির মালিক। রহিমের এখন স্থায়ী ঠিকানা বাবুরাবাদ। জমি তাঁর ভাগ্যের পরিবর্তন এনে দিয়েছে। বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থা উত্তরণের সহযোগিতায় সরকারের কাছ থেকে পাওয়া খাস জমিতে রহিম এখন সুখী মানুষ। জীবন সংগ্রামে বদলে গেছে রহিমের জীবন চিত্র। কিন্তু অতীতে রহিমের জীবনটা এত সুখের ছিল না। রহিমের গ্রামের বাড়ি ছিল সাতক্ষীরা জেলার আশাশুনি উপজেলার শোভনালি ইউনিয়নের বাটরা গ্রামে। রহিমের দাদা শোকর গাজির কোন জমিজমা ছিল না। রহিমের বাবার নাম মানিক। ১৮ শতক জমির এক কোণায় মানিকের ছোট কুঁড়েঘর। রহিম স্কুলে যেত, কিন্তু চতুর্থ শ্রেণীতে ওঠার পর প্রায় সময়ই ঘরে খাবার থাকতো না। মাঝে মাঝে মা তাকে পান্তার পানি খেতে দিত। রহিম পান্তার পানি খেয়ে স্কুলে যেত। ২/৩ বছরের মধ্যে বাবা তাকে আর কোন নতুন জামা কিনে দিতে পারলো না। রহিমের লেখা-পড়া বন্ধ হয়ে যায় ক্লাস পঞ্চম শ্রেণীতে উঠলেই। রহিম স্কুল বাদ দিয়ে পাট ক্ষেতে যেত ঘাস বাছতে। পাটের ক্ষেতে সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত ঘাস বাছতো সে। দিন শেষে টাকা পেত মাত্র ৫ টি করে। রহিমের বয়স যখন মাত্র ১৮ বছর তখন বাবার সিদ্ধান্তে কাজলা গ্রামের মনিরউদ্দিন সরদারের একমাত্র কন্যা সখিনার সাথে তার বিয়ে হয়। রহিমের বিয়ের বছর পাঁচেকের মাথায় একদিন রহিম ও তার ভাইয়ের মধ্যে ঝগড়া হয়। বাবা-মা ভাই সাত্তারের পক্ষে অবস্থান নিয়ে রহিমকে সংসার থেকে আলাদা করে দেয়। আলাদা করার সময় বাবা তাকে মাত্র আড়াই কেজি চাল দিয়েছিল। স্ত্রী সখিনাকে নিয়ে কাজলায় শ্বশুর বাড়িতে আসে রহিম। শ্বশুর রহিমকে বাবুরাবাদে আসতে বলে। ছোট শালা সিরাজকে নিয়ে রহিম বাবুরাবাদে আসে জমির সন্ধানে। এসব ১৯৯২ সালের কথা। বাটরা গ্রামের আঃ রহিম গাজি নতুন ঠিকানা তৈরী করলো বাবুরাবাদ গ্রামে এসে। রহিম বাবুরাবাদ একটা খালের পাশে ছোট ছোট চাঁরটে খুটি পুতে কুঞ্চির বেড়া দিয়ে ঘর তুলেছিল। তারপর তালপাতা দিয়ে তৈরী করে ঘরের ছাউনি। রহিমের তখন দুই ছেলে আর দুই মেয়ে। রহিমা, নাছিমা, মামুন আর বাচ্চু । বাবুরাবাদে তখন কোন কাজ ছিল না ।

খাসজমি নিয়ে প্রভাবশালী আর ভূমিদস্যুদের অত্যাচার মোকাবেলা করেছে রহিম। খাস জমির জন্য যুদ্ধের স্মৃতি রহিমকে এখনও উজ্জীবিত করে। ১৯৯৮ সালের ১০মে থেকে তাদের উপর অত্যাচার শুরু হয়। ২৭ শে জুলাই ভূমিহীনদের উপর পুলিশ ও ভূমিদস্যুদের গুলি ও হামলার পর যারা আহত হয় উত্তরণ তাদের চিকিৎসার জন্য সাতক্ষীরা, খুলনা ও ঢাকায় নিয়ে যায়। চাল, ডাল, তেল, নুন, শাড়ি, কম্বল, লুঙ্গি সবই দেয়। দুই হাজার করে টাকাও দেয়। রহিমের সরল স্বীকারোক্তি "উত্তরণ আছে বলেইতো এত সহজে জমির দলিল হলো, দেহেন আজ দলিল হয়েছে বলেই কিন্তু আমরা সবাই কত সুখে রইছি, অথচ যহন দলিল ছিল না তহন যে কত কষ্ট গেছে----।"

প্রভাবশালীদের পরামর্শে এক শ্রেণীর দুর্নীতিবাজ কর্মচারী কর্মকর্তারা জমির শ্রেণী পরিবর্তন করে কৃষি খাসজমিকে 'বিশেষ জলমহালে' রূপান্তরিত করে রাখে। এই জমি ভূমিহীনদের মাঝে বিতরণ করতে হলে পুনরায় কৃষি খাসজমিতে রূপান্তরিত করা ছাড়া বিতরণের কোন উপায় সরকারের ছিল না। কিন্তু এ কাজটি কোনভাবেই হচ্ছিল না। ২০০৪ সাল থেকে শুরু করে ২০০৫ সালে এসে জমির শ্রেণী পরিবর্তনের কাজটি সম্পন্ন হয় উত্তরণের সহযোগিতায়। জমির শ্রেণী পরিবর্তনের পর আবার নতুন করে ভূমিহীন বাছাই হয়। জমির ম্যাপ তৈরী, ট্রেসিং পেপারের সহযোগিতা, সার্ভেয়ারের সহযোগিতা, দলিল কম্পিউটারাইজ করে দেয়া, ভূমিহীনদের দলিলের খরচ সব ব্যয়ই উত্তরণ বহন করে।

উত্তরণের সহযোগিতায় রহিমের নামে এক একর জমির দলিল হয় মার্চ ৩০, ২০০৬ তারিখে। জমির দলিল নিশ্চিত হওয়ার পূর্ব থেকেই সে এই জমি দখলে রেখেছিল। জমি পাওয়ার আগে রহিমের অবস্থা খারাপ ছিল। জমি পাওয়ার আগে তাকে ছেলেমেয়ে নিয়ে প্রায়ই না খেয়ে থাকতে হতো। এখন তাঁর কাছে সেই সব দিনগুলি দুঃস্বপ্নের মত মনে হয়। সে এখন ছেলেমেয়ে, বউ নিয়ে তিন বেলা শাক-সবজী দিয়ে ভাত খায়। মাছ ছাড়া তাদের এখন একবেলাও ভাত খাওয়া হয়না। মাসে তিন/ চার দিন মাংস আর সপ্তাহে মাছের সাথে দুই/তিন দিন তারা সবাই মিলে ডিম দিয়ে ভাতও খেয়ে থাকে।

দলিল পাওয়া জমিতে রহিম ত্রিশ হাজার টাকা খরচ করে এখন সে আট চালা ঘর তুলেছে। আগে তার কোন রান্না ঘর ছিল না। এখন রান্নাঘর বেঁধেছে। রহিমের ইচ্ছা কিছু দিনের মধ্যে পাঁকা ঘর তুলবে। ইতোমধ্যে সে ইট দিয়ে একটা পাকা গোয়াল ঘর তুলেছে। বাকী জমিতে রহিম মাছ চাষ করে। মেঝ মেয়ে নাছিমা মাধ্যমিকে দ্বিতীয় আর উচ্চ মাধ্যমিকে তৃতীয় বিভাগে পাশ করেছে। ছেলেমেয়েরা সবাই লেখাপড়া করছে। একজন ষষ্ঠ শ্রেণীতে আর একজন মাদ্রাসায় আর সবচেয়ে ছোটটা তৃতীয় শ্রেণীতে পড়ছে। রহিম তার বাড়িতে রিং-স্লাব দিয়ে পায়খানা ঘর তৈরী করেছে।

খাসজমি বদলে দিয়েছে রহিমের ভাগ্য। ঘেরে মাছ চাষ করে রহিম এখন অনেক টাকার মালিক। রহিম ৩০,০০০/- টাকা দিয়ে দেড় বিঘা জমি বন্ধক রেখেছে। বন্ধকী জমি থেকে এবছর সে ২৫ মণ ধান পাবে বলে মনে করছে। তাছাড়া দু'বিঘা জমিও কিনেছে সে। গত বছর ঘেরে ৫০,০০০/- টাকা লাভ ছিল। এবছরও এমন থাকবে বলে সে আশা করছে। বাড়ির সামনে পুকুর কেটে সেখানে সাদা মাছ ছেড়েছে। বাড়ির চারপাশে ১০টি শিশু, ২টা ছফেদা, ১টা কুল, ২টা ডালিম, ৪টি খই গাছ আর ১০টি খেজুর গাছ রয়েছে। রহিমের ঘরে রয়েছে নিম কাঠের ২টি খাট, সেগুন কাঠের ১টি শো-কেস। তাছাড়া ৭ মণ চাল রাখা যায় এমন একটা ড্রামও রয়েছে তার ঘরে। রহিম বলে,'আগে যেখানে আটার জাউ খাতাম, সেখানে এখন চাল কিনি একসাথে ৩/৪ মণ।'

আব্দুর রহিমের রয়েছে, ৪টি হাঁস, ১২টি মুরগি, ৪টি ছাগল। ঘরে তার একটা সাইকেল রয়েছে। ঘেরে বর্তমানে মাছ রয়েছে ৭০,০০০/- টাকার। আব্দুর রহিমের কাছে জমির মূল্য অনেক। এ জমি তাদের রক্তের বিনিময়ে পাওয়া। রক্ত কখনও বিক্রি করা যায় না। এ জমি তাদের সকলের ঘরে ঘরে হাসি ফুটিয়েছে। নিরাপদ আশ্রয়ে রহিম এখন ছেলে মেয়েদের নিয়ে সোনালী স্বপ্নের দিন কাটায়।

সংগ্রামী সুফিয়া

সংগ্রামের প্রতীক সুফিয়া। সে ভাগ্য বিড়ম্বিতা। দীর্ঘ সংগ্রামের পর সুফিয়া এখন সুখের মুখ দেখেছে। নুন আনতে পান্তা ফুরানোর কঠিন সময় সে পার করেছে। তার মাথা গোঁজার ঠাঁই হয়েছে। বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা উত্তরণের সহযোগিতায় সরকারের দেয়া খাসজমি পেয়ে সে এখন ভূমিহীন থেকে ভূমি মালিক। সুফিয়ার উপার্জনের একটি নির্দিষ্ট অবলম্বন হয়েছে। মর্যাদা নিয়ে বেঁচে থাকার শক্তি হয়েছে। সরকারি খাসজমি ও জমির দলিল পেয়ে সুফিয়া এখন স্বাবলম্বী।

আনছার আলী সরদার বিয়ে করেন নলতার আমেনা খাতুনকে। এই ঘরেই সুফিয়ার জন্ম। জুয়া খেলে আনছার আলী এক সময় তার সকল সম্পত্তি বিক্রি করে ফেলে। মাথা গোঁজার ঠাঁই হারিয়ে যায়। এক পর্যায়ে বিলান এলাকা নোড়ারচকে চলে আসেন আনসার আলী। তখন সুফিয়ার বয়স ৪ বছর। সুফিয়ার স্কুলে যাবার সুযোগ হয় না। ৭ বছর বয়সে তাকে গেরস্থ বাড়ীতে কাজের জন্য রাখা হয়। কষ্ট, যন্ত্রণা, লাঞ্ছনা আর অভাবে কাটতে থাকে সুফিয়ার শৈশব। ১৪ বছর বয়সে সে বিলে জন (কামলা) দিতে শুরু করে।

৭ বছর বয়স থেকে শুরু করে ২২ বছর পর্যন্ত সুফিয়ার জীবন কেটেছে বেঁচে থাকার জন্য সংগ্রাম আর ভাগ্যের সাথে লড়াই করে। বিয়ের পর স্বামী পেলেও সতীনের জন্য স্বামীর ঘর পায়নি। সুফিয়ার ৫ বছরের একটা কন্যা সন্তান আছে। নাম আছিয়া। আছিয়া এখন সুফিয়ার বেঁচে থাকার স্বপ্ন। খাসজমি আর বেঁচে থাকার অধিকার আদায়ের সংগ্রামের যুদ্ধের চিহ্ন এখনো সুফিয়ার শরীরে। ভূমিদস্যু আর পুলিশের সাথে যুদ্ধ করার সময় তার গায়ে বিঁধে থাকা বন্দুকের ছররা এখনো তার শরীরে সংগ্রামের সাক্ষ্য বহন করছে।

১৯৯৫ সালে সুফিয়া ও তার ভাই নোড়ারচক থেকে বাবুরাবাদে চলে আসে । ১৯৯৮ সালের ১০মে শুরু হয় ভূমিহীনদের উপর প্রশাসন ও ভূমিদস্যুদের লাঠিয়াল বাহিনীর বর্বর নির্যাতন। ভূমিহীনরা প্রতিরোধ গড়ে তোলে। 'উত্তরণ' ভূমিহীনদের ভূমি অধিকার সংরক্ষণের জন্য সর্বাত্মক সাহায্য নিয়ে এগিয়ে আসে। গৃহহীন ভূমিহীনদের আশ্রয় এবং আহতদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করে। ২৭ জুলাই পুলিশ ও লাঠিয়াল বাহিনী ভূমিহীনদের উপর বেপরোয়া লাঠিচার্জ করে। টিয়ার গ্যাস ছোড়ে। রবার বুলেটের পর রাইফেল থেকে গুলি ছোঁড়ে। পুলিশের গুলিতে সুফিয়ার পাশে থাকা জায়েদা নিহত হন ও তিন শতাধিক ভূমিহীন নারী, পুরুষ ও শিশু আহত হয়। ছররা গুলি সুফিয়ার সারা শরীরে আঘাত করে। জায়েদার মৃত্যুর পর ভূমিহীনদের খাসজমির লড়াই এ নতুনমাত্রা যোগ হয়। ভূমি অধিকার আদায়ের সংগ্রামে প্রতিটি আন্দোলন সংগ্রামে সুফিয়া থাকে সবার আগে।

১৯৯৮ সাল থেকে ২০০৬ সাল পর্যন্ত সুফিয়া ভূমিহীন জনপদে পড়ে থাকে এক খন্ড জমির জন্য। ভূমিহীন বাছাই, তালিকা তৈরী, খাসজমির দলিল তৈরী ও হস্তান্তরসহ জমির দখল বুঝিয়ে দিতে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ভূমিহীনদের দারিদ্র্য বিমোচনে সহায়তা করে উত্তরণ। উত্তরণের সহযোগিতায় সুফিয়া বিল কাজলা মৌজার ১নং খতিয়ানের ৬৬, ১০৯, ও ১১০ দাগের ৭০ শতক জমির দলিল বুঝে পান ২০০৬ সালে।

সুফিয়া একটু ভাতের জন্য এক সময় এ গ্রাম থেকে অন্য গ্রামে ছুটেছে। ভাতের মাড় এনে ভাই বোন মিলে খেয়েছে। ৭ বছর থেকে পরের বাড়িতে কাজ আর ১৪ বছর থেকে মাঠে কামলা খেটে জীবন সংগ্রামে বেঁচে আছে সুফিয়া। দলিল পাওয়ার পর সুফিয়া জমিতে একটি ঘর তুলেছে। সরকারের দেয়া খাস জমির প্রায় দেড় বিঘা জমিতে সে এখন চিংড়ি চাষ করে। ঘরে অসুস্থ বাবা ও ভাইদের নিয়ে সে থাকে। সাথে রয়েছে তার একমাত্র কন্যা আছিয়া। বাড়ির আঙ্গিনায় পেঁপেসহ বিভিন্ন প্রজাতির ফলের গাছ লাগিয়েছে সুফিয়া।

সুফিয়া নিজে স্কুলে যেতে পারেনি। কিন্তু মেয়েকে সে লেখাপড়া শেখানোর জন্য এবার স্কুলে ভর্তি করেছে। আটশ বিঘা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রথম শ্রেণীর ছাত্রী আছিয়া। সমিতি থেকে সুদমুক্ত ৫ হাজার টাকা ঋণ নিয়ে সে ঘেরের ভেড়ি বাঁধ মেরামত করা সহ ঘেরে বাগদা চিংড়ির পোনার চাষ করছে । সরকারী খাসজমি বদলে দিয়েছে সুফিয়ার জীবন। ঘেরে সে নিজে কাজ করে। মাছ ছাড়া ও ধরা থেকে শুরু করে ঘেরের সব কাজ নিজেই করে সে। এ ছাড়া সময় পেলে সুফিয়া অন্যের জমিতে কাজ করে নগদ টাকা উপার্জন করে।

সুফিয়া এখন স্বাবলম্বী। মাথা গোঁজার ঠাঁই পেয়ে এবং জমির দলিল পেয়ে সুফিয়ার জীবন চিত্র বদলে গেছে। সংসারে মাসের খরচ বাদ দিয়ে তার একটি নির্দিষ্ট সঞ্চয় রয়েছে। মেয়ের ভবিষ্যত চিন্তা করেই তার এই সঞ্চয়। ঘেরের লাভের টাকায় সে পরিবারের জন্য মাসের চাল কেনে। ঘেরে মাছ চাষের পাশাপাশি সে বাড়িতে ছাগল ও গরু পালন করে। তার একটি গরু রয়েছে। চিকিৎসার জন্য সে এখন হাসপাতালে যায়। গ্রামের লোকদের হাসপাতালে যেতে পরামর্শ দেয়। বাড়িতে স্বাস্থ্যসম্মত ল্যাট্রিন বসিয়েছে। প্রতিদিনের খাবারের জন্য এখন সুফিয়াকে চিন্তা করতে হয়না। তিনবেলা ভাত এখন তাদের নিয়মিত খাবার। শাক সবজি আর মাছ রয়েছে প্রতিদিনের খাদ্য তালিকায়। আত্মীয়-স্বজন এলে এই তালিকায় যোগ হয় মাংস। বাড়ির হাঁস আর মুরগির ডিম বাবা ও মেয়েকে খাইয়ে পুষ্টির অভাব মেটায় সুফিয়া।

সংগ্রামী সুফিয়া এবং জীবন যুদ্ধে জয়ী রহিমের মতো আরো সহস্র সাফল্যগাঁথা রচনা হতে পারে সঠিক ও ন্যায্য ভূমি বন্টন ব্যবস্থার মাধ্যমে। দেখা গিয়েছে যে, ভূমিহীন পরিবারের উপার্জনের একমাত্র উপায় হলো শ্রমবিক্রি এবং তাদের মাসিক আয় বর্তমান বাজার মূল্যে দুই থেকে আড়াই হাজার টাকার উর্ধ্বে নয়। এই পরিমাণ আয় হতে কোনক্রমেই তিনবেলা আহার জোটানো সম্ভব নয়। তারপর চিকিৎসা, বস্ত্র, শিক্ষার মত অত্যাবশ্যকীয় ব্যয় মিটানো অত্যন্ত দুরুহ। এই কারণে ভূমিহীন পরিবারের পক্ষে চিকিৎসা ও শিক্ষার জন্য কোন ব্যয় নির্বাহ করা সম্ভবপর হয়না। কিন্তু যে সমস্ত পরিবার খাসজমি পেয়েছে তাদের পারিবারিক আয় এখন শুধুমাত্র শ্রমবিক্রির উপর নির্ভরশীল নয়। উৎপাদনশীল উপকরণ হিসেবে জমির ওপর তাদের মালিকানা প্রতিষ্ঠার সাথে সাথে পারিবারিক আয় বহুমূখী হয়ে উঠেছে। কৃষি থেকে অতিরিক্ত আয় তাদের জীবন জীবিকার মান উন্নয়নের জন্য নানামূখী অর্থনৈতিক ক্রিয়াকর্ম যেমন হাঁস মুরগী ও গবাদি পশু পালন, ক্ষুদ্র ব্যবসা ইত্যাদি ক্ষেত্রে তারা বিনিয়োগ করছে। তাছাড়া পরিবারের সদস্যদের স্বাস্থ্য ও শিক্ষা বাবদ অতিরিক্ত খরচ করা সম্ভব হচ্ছে।

৫. আইনি সুযোগ ও সীমাবদ্ধতা

আমরা জানি, খাসজমি ভূমিহীনদের মাঝে হস্তান্তরের মাধ্যমে দারিদ্র্য দূর করার জন্য আইনি সুযোগ বিদ্যমান থাকলেও দেশের ৮,০৩,৩০৮.৮০ একর কৃষি খাসজমির মধ্যে এ যাবত মাত্র ৩,৪৯,২৮৮.৪৪ একর বন্টিত হয়েছে, বাকী বিশাল পরিমাণ খাসজমি এখনো বন্টিত হয়নি।

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, ১৭৯৩ সালের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত এবং ১৮৮৫ সালের বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইন বাস্তবায়নের মাধ্যমে দারিদ্র্যের যে বিষবৃক্ষ রোপিত হয়েছিল তা উপড়ে ফেলার, দারিদ্র্য অবস্থা এবং ক্রমবর্ধমান ভূমিহীনতা মোকাবিলার একটি ঐতিহাসিক সুযোগ সৃষ্টি হয়েছিল ১৯৪৭ সালের দেশভাগের পর বঙ্গীয় জমিদারী অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইন-১৯৫০ পাশের মাধ্যমে।

জমিদার, নীলকর তথা বৃটিশ বিরোধী কৃষক ও গণ আন্দোলনের দীর্ঘ পথপরিক্রমায় সামন্ত প্রভূদের হটিয়ে নাগরিকের রাষ্ট্র ধারণায় জমি ভোগদখলকারী জমিদারের প্রজা হল রাষ্ট্রের নাগরিক। এ আইনের মাধ্যমে সরকার ও কৃষকের মধ্যকার সকল প্রকার মধ্যস্বত্ব ভোগীর বিলোপ ঘটে, এসময় জমির নকশা ও স্বত্বলিপি প্রস্তুত এবং হালনাগাদ করার ব্যবস্থা নেয়া হয় এবং এর বিরুদ্ধে দেওয়ানী মামলা দেয়া চলবে না বলে আইনে প্রতিবন্ধকতা হয়। এ আইনের একটি উল্লেখযোগ্য দিক ছিল সর্বাধিক ৩৭৫ বিঘা পর্যন্ত জমির মালিকানা নির্ধারণ করা এবং সিলিং উদ্বৃত্ত জমি রাষ্ট্রের অধীনে ন্যস্ত করা। এছাড়া জমিদারের অধীনে থাকা জনগণের ব্যবহার্য সকল অকৃষি জমি যেমন, রাস্তাঘাট, হাট-বাজার, নদী-খাল, কৃষির অনুপযোগী জমি ইত্যাদি সরকারের আওতায় রাখা।

কিন্তু ১৯৫০ সালের বঙ্গীয় জমিদারী অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইন-১৯৫০ যথাযথ বাস্তবায়ন না হওয়ার কারণে ভূমিহীনতা ও দারিদ্র্য রোধে তা কার্যকর কোন ভূমিকা রাখতে ব্যর্থ হয়েছে। বিশেষ করে এ আইন পাশের পর সরকারের হাতে যে বিপুল পরিমাণ খাসজমি আসার কথা ছিল তা আসেনি। আইন পাশের পর জমিদারদের অধীনে থাকা পত্তনীবিহীন বা জমিদারী খাস সম্পত্তিসমূহের একটি বড় অংশ এবং ৩৭৫ বিঘার সিলিং উদ্বৃত্ত বেশির ভাগ জমিই সরকারের ১নং খাস খতিয়ানভূক্ত না করে প্রাক্তন জমিদারদের নামে স্বত্বলিপি প্রণয়ন করা হয়। এ আইনের ১৭ ধারা অনুযায়ী খতিয়ান বা স্বত্বলিপি প্রস্তুতের কাজ শুরু হয় এবং ১৭ (৩)(১) উপ-ধারা মোতাবেক ১৮৮৫ সালের প্রজাস্বত্ব আইন এবং পরবর্তীতে ১৯৩৬ সালের সিলেট প্রজাস্বত্ব আইনে প্রণয়নকৃত খতিয়ান সমূহ এ আইনেই প্রণয়ন করা হয়েছে বলে ধরে নেয়া হয়। এখানে উল্লেখ্য যে, ১৮৮৫ সালের রেকর্ড মোতাবেক সকল পত্তনিবিহীন, গড়লায়েক ও সর্বসাধারণের ব্যবহার্য জমির মালিক ছিল ১৭৯৩ সালের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মূলে থাকা জমিদাররাই। এসমস্ত জমিদারের অনেকেই ৫০ সালের পূর্বে মারা গেলেও তাদের নামে রেকর্ড বহাল রাখা হয়। তাই জমিদারদের নামে প্রণয়নকৃত স্বত্বলিপিতে ১৯৫০ সালেও কোন পরিবর্তন হয়নি। ফলে ১৯৬৫ সালে ভারত পাকিস্তান যুদ্ধকালীন সময়ে জারিকৃত শত্রু সম্পত্তি আইনের আওতায় অনাবাসিক হিন্দু জমিদারদের নামীয় সম্পত্তির বেশিরভাগই শত্রু সম্পত্তি হিসেবে তালিকাভূক্ত করা হয়। যদিও প্রজাস্বত্ব আইনের ২০, ২৩ এবং ৯২ ধারা মোতাবেক পরবর্তীতে সেগুলিকে ১ নং খাসখতিয়ানভূক্ত করা যেত, কিন্তু দীর্ঘদিন অতিবাহিত হলেও সেটাও করা হয়নি। ফলে এ সমস্ত সম্পত্তির অধিকাংশই প্রথমে শত্রু সম্পত্তি এবং পরবর্তীতে অর্পিত সম্পত্তি হিসেবে চিহ্নিত ও তালিকাভূক্ত করে ভূমিহীনদের মাঝে বিতরণ না করে প্রভাবশালীদের মাঝে ইজারা দেয়া হয়েছে বা এখনো হচ্ছে।

১৯৭১ সালে স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয় এবং এরপর ১৯৭২ সালে বঙ্গবন্ধু সরকার রাষ্ট্রপতির অধ্যাদেশ (পিও-৯৮) জারীর মাধ্যমে ভূমিহীনদের খাসজমিতে অধিকার প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ নেন। এ অধ্যাদেশের উল্লেখযোগ্য দিক ছিল জমির সর্বোচ্চ সিলিং ১০০ বিঘায় নির্ধারণ, ২৫ বিঘা পর্যন্ত জমির খাজনা মওকুফ এবং নদীর জেগে ওঠা চর খাসজমি হিসাবে সরকারের কাছে নিয়ে আসা এবং তা ভূমিহীনদের মাঝে বিতরণের ব্যবস্থা করা। ভূমি মন্ত্রণালয়ের ব্যবস্থাপনাধীন কৃষি ও অকৃষি এই দুই প্রকারের সরকারী খাসজমি আছে। ১৯৭২ সাল থেকে উল্লিখিত আইনের আলোকে সরকারের ভূমি সংস্কার কর্মসূচি অনুযায়ী শুধুমাত্র কৃষি খাসজমিসমূহ ভূমিহীনদের মধ্যে বিতরণের কাজ শুরু হয়। বঙ্গবন্ধু সরকারের পরবর্তী পর্যায়ে এ কার্যক্রম আর গতি লাভ করেনি। এ আইনের ফলে সরকারের হাতে যে পরিমাণ খাসজমি আসার কথা ছিল তাও আসেনি। বিশেষ করে ১০০ বিঘার সিলিং উদ্বৃত্ত জমি সরকারের ১নং খাস খতিয়ানভুক্ত করার কথা থাকলেও সেটাও করা হয়নি। জবরদখলকারী একশ্রেণীর প্রভাবশালী ভূ-স্বামী ও দূর্নীতিপরায়ন সরকারী কিছু কর্মচারীর যোগসাজশ ও আমলাতান্ত্রিক জটিলতায় এসমস্ত জমি সরকার তার নিজের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে প্রকৃত ভূমিহীনদের মাঝে বিতরণ করতে ব্যর্থ হয়েছে।

এরপর বাংলাদেশের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ও বড় ভূমি সংস্কারটি হয়েছে ১৯৮৪ সালে। জমির সুষম ব্যবহার ও আয়ের সুষম বন্টন, জমির পূন:উৎপাদন ক্ষমতা কাজে লাগানো, ভুমিহীন পরিবারের পূনর্বাসন ও কর্ম সংস্থান সৃষ্টি এবং গ্রাম থেকে শহরমূখী জনস্রোত কমানো ও গ্রামীণ অর্থনীতিতে প্রাণ সঞ্চার করার উদ্দেশ্য নিয়ে এ সময় তৎকালীন সামরিক সরকার ভূমি সংস্কার অধ্যাদেশ ১৯৮৪ জারী করেন। এ আইন অনুযায়ী কৃষি জমি অর্জনের সীমা ব্যক্তি বা পরিবারের ক্ষেত্রে ৬০ বিঘা ধার্য্য করা হয়, বেনামী লেনদেন বাতিল করা হয়, আইন মোতাবেক অধিগ্রহণ ছাড়া মালিককে তার বাস্তুভিটা হতে উচ্ছেদ করা যাবেনা, বর্গা চুক্তি আইন পাশ এবং গ্রামীণ এলাকায় কাউকে বাস্তুভিটা হতে উচ্ছেদ চলবে না বলে আইন প্রণয়ন করা হয়। এ আইনের ভিত্তিতে ১৯৮৭ সালে ভূমি মন্ত্রণালয় শাখা-৪ হতে ভূমিহীনদের মাঝে খাসজমি বন্দোবস্তের নিয়মনীতি ও বিস্তারিত পদ্ধতি প্রণয়ন করা হয়।

এই নীতিমালার আওতায় ভূমিহীনদের মধ্যেই কৃষি খাসজমি বিতরণের বিধান রাখা হয় এবং এ বিতরণ কার্যক্রম বহু পূর্বেই সম্পন্ন করার কথা ছিল। কিন্তু এটি একটি ব্যাপক ও জটিল কার্যক্রম বিধায়, ভূমিহীনদের মধ্যে কৃষি খাসজমি বন্টন কর্মসূচি অব্যাহত রাখার লক্ষ্যে সরকার তার সময়সীমা বৃদ্ধি করে এবং প্রকৃত ভূমিহীনদের মধ্যে বন্দোবস্তযোগ্য কৃষি খাসজমি বন্টনের লক্ষ্যে ১৬ ই এপ্রিল ১৯৯৭ তারিখে ভূমি মন্ত্রণালয়ের শাখা-৮ কর্তৃক বিজ্ঞপ্তি নং- ভূম/শা-৮/খাজব/৪৬/৮৪/২৬১ (তারিখ ১২মে ১৯৯৭ বাংলাদেশ গেজেট) এর মাধ্যমে কৃষি খাসজমি ব্যবস্থাপনা ও বন্দোবস্ত নীতিমালা জারি করে। এর আওতায় রাঙ্গামাটি, বান্দরবান ও খাগড়াছড়ি - এই তিনটি পার্বত্য জেলা ব্যতীত বাকী ৬১ টি জেলার বন্দোবস্তযোগ্য সকল কৃষি খাসজমি ভূমিহীনদের মধ্যে বন্টন করার কথা বলা হয়।

উল্লিখিত নীতিমালাও আবার সরকার বিভিন্ন সময়ে সংশোধন, সংযোজন-বিয়োজন ও পরিবর্তন করেছে। সর্বশেষ ২০০৯ সালের ২৬ মে ২০০৯ তারিখ বিজ্ঞপ্তি নং- ভূম/শা-৪/কৃখাজব-২/২০০৯-১৭৩,১৭৪ এর মাধ্যমে সরকার এ সংক্রান্ত পরিবর্তিত, সংযোজিত ও নতুন গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ প্রকাশ করে।

বিদ্যমান নীতিমালা অনুযায়ী সরকারের হাতে থাকা শুধুমাত্র কৃষি খাসজমি ভূমিহীনদের মাঝে বন্দোবস্ত করার কথা বলা হয়। এ নীতিমালায় কৃষি খাসজমির সংজ্ঞা নিম্নরূপ-

"বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটের মাধ্যমে ৮ ই মার্চ /১৯৯৫ ইং তারিখে জারীকৃত অকৃষি খাসজমি ব্যবস্থাপনা ও বন্দোবস্ত নীতিমালার আওতায় সংজ্ঞায়িত অকৃষি খাসজমি বাদে অন্যান্য সকল জমি কৃষি খাসজমি হিসাবে গণ্য হইবে। অর্থাৎ দেশের সকল মেট্রোপলিটন এলাকা, সকল পৌর এলাকা এবং সকল থানা সদর এলাকাভূক্ত সকল প্রকার জমি ব্যতীত ইহার বাহিরে অবস্থিত কৃষিযোগ্য সকল খাসজমিই কৃষি খাসজমি হিসাবে বিবেচিত হইবে।

একইসাথে এ নীতিমালা অনুযায়ী ভূমিহীন পরিবার বলতে বুঝায়-

(ক) যে পরিবারের বসতবাড়ী ও কৃষি জমি কিছুই নাই, কিন্তু পরিবারটি কৃষি নির্ভর।

(খ) যে পরিবারের ১০ শতাংশ পর্যন্ত বসতবাটি আছে কিন্তু কৃষিযোগ্য জমি নাই, এইরুপ কৃষি নির্ভর পরিবারও ভূমিহীন হিসেবে গণ্য হইবে।

উল্লিখিত ভূমিহীন পরিবারকে খাসজমি স্থায়ী বন্দোবস্ত দেয়ার ক্ষেত্রে নিম্নবর্নিত অগ্রাধিকার তালিকা অনুসরণ করা হবে

(ক) দুঃস্থ মুক্তিযোদ্ধা পরিবার।
(খ) নদী ভাঙ্গা পরিবার।
(গ) সক্ষমপুত্রসহ বিধবা বা স্বামী পরিত্যক্তা পরিবার।
(ঘ) কৃষি জমিহীন ও বাস্তভিটাহীন পরিবার।
(ঙ) অধিগ্রহণের ফলে ভূমিহীন হওয়া পরিবার।
(চ) অনধিক ০.১০ একর বসতবাটি আছে, কিন্তু কৃষি জমি নেই এমন কৃষি নির্ভর পরিবার।

এটা স্পষ্ট যে, গ্রামীণ দরিদ্রদের মধ্যে দরিদ্রতম জনগোষ্ঠীই উল্লিখিত ভূমিহীন পরিবারের সংজ্ঞার সাথে সম্পূর্ণরূপে সামঞ্জস্যপূর্ণ। সেজন্য একথা অত্যুক্তি হবেনা যে, এ নীতিমালা মোতাবেক যদি প্রকৃত ভূমিহীনদের মাঝে খাসজমি হস্তান্তর করা হতো তাহলে দেশের এক বিরাট দরিদ্র জনগোষ্ঠী কৃষিজমির মালিকানা লাভ করে ভূমিহীনতা তথা দারিদ্র্যের হাত থেকে নিস্কৃতি পেত। কিন্তু বিদ্যমান কৃষি খাসজমি ব্যবস্থাপনা ও বন্দোবস্ত নীতিমালার কিছু সীমাবদ্ধতার কারণে খাসজমি বন্দোবস্ত কার্যক্রমের সুফল দরিদ্ররা পায়নি। নিম্নে নীতিমালা এবং তা বাস্তবায়নে কিছু উল্লেখযোগ্য পদ্ধতিগত সীমাবদ্ধতার কথা উল্লেখ করা হল -

- নীতিমালা তৈরি করা হয়েছে শুধুমাত্র কৃষি খাসজমি স্থায়ী বন্দোবস্ত দেয়ার জন্য কিন্তু অকৃষি খাসজমি বা অস্থায়ী ইজারা দেয়ার জন্য ভূমিহীন দরিদ্রদের অগ্রাধিকার দেয়া হবে, এমনটি নীতিমালায় উল্লেখ নেই। ফলে শ্রেণী পরিবর্তনের জটিলতায় লক্ষ লক্ষ একর খাসজমিতে ভূমিহীনরা অধিকার নিতে পারছেনা।
- নীতিমালা মোতাবেক জাতীয়, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে কৃষি খাসজমি ব্যবস্থাপনা ও বন্দোবস্ত কমিটি থাকলেও ইউনিয়ন ও ওয়ার্ড পর্যায়ে কোন কমিটি নেই। ফলে এত ব্যাপক কাজ শুধুমাত্র একটি কমিটি দ্বারা করা কখনোই সম্ভব নয়।
- মাঠ পর্যায়ের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা কমিটিতে বেশীরভাগ সদস্যই স্থানীয় নন। এরা উপজেলা পর্যায়ের সরকারী কর্মকর্তা। বাকীদের অনেকে স্থানীয় থাকলেও জেলা প্রশাসক ও ভূমি মন্ত্রী কর্তৃক মনোনীত। কমিটির এ সকল সদস্য বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দলীয় প্রভাবে প্রভাবিত হয়ে প্রভাবশালীদেরই স্বার্থ রক্ষা করেন ফলে প্রকৃত ভূমিহীনরা বঞ্চিত হয়।
- বর্তমান উপজেলা বা জেলা কমিটিতে এনজিও এবং সত্যিকার ভূমিহীনদের পক্ষে প্রতিনিধিত্ব করার মতো ব্যক্তির অংশগ্রহণের সুযোগ একেবারেই নেই। ফলে এ কমিটিগুলোর নিকট থেকে নিরপেক্ষ ও আন্তরিকভাবে খাসজমি বন্দোবস্ত কার্যক্রম পরিচালনা করা যথেষ্ট প্রশ্ন সাপেক্ষ।
- খাসজমি ভূমিহীনদের মাঝে বন্দোবস্ত সংক্রান্ত নীতিমালার ৬ (চ) ধারায় বলা হয়েছে- *আবেদনের সাথে স্থানীয় ইউপি চেয়ারম্যান কর্তৃক প্রদত্ত ভূমিহীন সার্টিফিকেট জমা দিতে হবে।* একজন ভূমিহীন দরিদ্র মানুষের পক্ষে স্থানীয় চেয়ারম্যানের কাছ থেকে ভূমিহীন সার্টিফিকেট পাওয়া কঠিন। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে চেয়ারম্যান সাধারণত তার অনুসারী ও আত্মীয়দেরকে ভূমিহীন সার্টিফিকেট দেয়। এখানে দুর্নীতির সুযোগ থাকে। এ সার্টিফিকেট সংগ্রহে রাজনৈতিক প্রভাবও কাজ করে।

- বন্দোবস্তযোগ্য কৃষি খাসজমি চিহ্নিত কিভাবে করবেন এ ব্যাপারে সুনির্দিষ্ট কোন গাইডলাইন যেমন নেই তেমনি পক্ষপাতদুষ্ট ও জনবিচ্ছিন্ন এ কমিটির দ্বারা খাসজমি চিহ্নিত ও উদ্ধার করার কাজ ব্যাপকভাবে করা কখনোই সম্ভব নয়।
- কমিটির বেশিরভাগ সদস্যই খাসজমি বন্দোবস্ত প্রক্রিয়া সর্ম্পকে অজ্ঞ। তাদের এ বিষয়ে সচেতন করার জন্য তেমন কোন কর্মসূচিও গ্রহণ করা হয়নি।
- এ নীতিমালায় খাসজমি প্রাপ্ত ভূমিহীনদের ভূমি ব্যবহারের জন্য কোন রাষ্ট্রীয় পৃষ্টপোষকতা দেয়ার কথাও বলা হয়নি।
- এ নীতিমালায় কোন জমি উদ্ধারে কোন সময়সীমা বেধে দেয়া হয়নি এবং উদ্ধারের প্রক্রিয়া কি হবে তাও সুনির্দিষ্ঠ করা হয়নি।

আমরা সকলেই জানি আইনি দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে বিভিন্ন কলা-কৌশলে প্রশাসন, বিত্তবান এবং ক্ষমতাবানদের ছত্রছায়ায় একশ্রেণীর ভূমিদস্যুরা অবৈধভাবে লক্ষ লক্ষ একর খাসজমি ভোগদখল করছে। কিছু ক্ষেত্রে স্থানীয় জোতদাররা দুর্নীতিবাজ প্রশাসনিক কর্মচারীদের সহায়তায় ভূমিহীন সেজে খাসজমি দখল ও স্থায়ী বন্দোবস্ত নিয়েছেন। এসব দুর্নীতিবাজ কর্মচারী ও জোতদারের বিরুদ্ধে কোন আইনি ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে বলে কখনো শোনা যায়নি। আবার অপরদিকে ভূমিহীনরা কেউ কেউ খাসজমি পেলেও নিজেরা সে জমি দখল রাখতে না পেরে হস্তান্তর করতেও বাধ্য হয়েছেন। এছাড়া বন্টিত খাসজমির একটি বড় অংশ ভূমিহীন নয় এমন ব্যক্তিরা বন্দোবস্ত পেয়েছেন। এমনকি সরকারের পক্ষে ভূমির উপর ভূমিহীনদের অধিকার বজায় রাখার জন্য যে ধরণের আইনি ও আর্থিক সহায়তা প্রয়োজন ছিল তাও ভূমিহীনদেরকে কখনো দেয়া হয়নি।

এটা সুস্পষ্ট যে, খাসজমি দরিদ্র ভূমিহীনদের মাঝে হস্তান্তরের যে আইন ও নীতিমালা আছে তার সীমাবদ্ধতা কাটানোর জন্য বিশেষ করে ১৯৫০ সালের জমিদারের নামীয় খাস সম্পত্তি ১ নং খাস খতিয়ানভূক্ত করা, ১৯৭২ সালের ১০০ বিঘা ও পরবর্তীতে ১৯৮৪ সালের ৬০ বিঘা সিলিং বহির্ভূত জমি সমূহ উদ্ধার করে ১ নং খাস খতিয়ানভূক্ত করা, প্রকৃত দরিদ্র ভূমিহীন চিহ্নিত ও অগ্রাধিকার ভিত্তিক তালিকা তৈরি করা, শুধু কৃষি খাসজমি নয় সকল প্রকার খাসজমিতে দরিদ্র ভূমিহীন মানুষের অভিগম্যতা বাড়ানো এবং দরিদ্ররা যাতে জমির দখল বজায় রাখতে পারে তার জন্য রাষ্ট্রের পক্ষে আর্থিক ও নৈতিক সমর্থন অব্যাহত রাখা দরকার।

শেষকথা

উল্লিখিত আলোচনার সূত্র ধরে বলা যায় যে, ভূমি বন্টনে সমস্যাসমূহ যথাসম্ভব দূর করে ভূমিহীন দরিদ্রদের খাসজমি দেওয়ার মধ্যে দিয়ে এবং উৎপাদক হিসেবে পুনর্বাসনের মধ্যে দিয়ে তাদের দারিদ্র বিমোচন সম্ভব হবে দৃষ্টিগ্রাহ্য মাত্রায়। তাদের জীবনমানে উত্তরণের সূচনা, আর্থসামাজিক প্রেক্ষাপটের মৌল পরিবর্তনের সূচনা চিহ্নিত হবে একটি অনন্য ঐতিহাসিক ঘটনা হিসেবে। দারিদ্র্য দূরীকরণের জন্য সরকারের সামাজিক নিরাপত্তা বা সেফটিনেট কর্মসূচিতে গেল ৩ বছরে যথাক্রমে ৪৬২৭, ৭৫৬৫, ৮৮৮২ কোটি টাকা বরাদ্দ দেওয়া হয়। পক্ষান্তরে সরকারের হাতে যে পরিমাণ খাসজমি আছে তার বর্তমান বাজার মূল্য প্রায় ৩ লক্ষ কোটি টাকা, যা সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির দেয়া টাকার অঙ্কের তুলনায় কয়েক গুণ বেশি। অতএব বলা যায় যে খাসজমির সুষ্ঠু বন্টনের মধ্য দিয়ে সমাজ ব্যবস্থায় আসতে পারে নিম্নোক্ত কাঠামোগত পরিবর্তন ঃ

- ❒ কর্মসংস্থান, উৎপাদন ও দেশিয় উৎপাদিত পণ্যের বাজার বিস্তার হবে।
- ❒ সম্পদ ও আয় বৃদ্ধি, সম্পদ সুরক্ষার সামর্থ্য বৃদ্ধি
- ❒ ঋণগ্রস্ততা হ্রাস, সঞ্চয় বৃদ্ধি এবং বিনিয়োগ ও ঋণ গ্রহণের সক্ষমতা বৃদ্ধি
- ❒ সামগ্রিক জীবনমান উন্নয়ন
- ❒ সামাজিক খাতগুলো যেমন- স্থানীয় সরকার, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, ব্যাংকিং ইত্যাদিতে দরিদ্র মানুষের অভিগম্যতা বৃদ্ধি
- ❒ কাজের খোঁজে গ্রামীণ শ্রমশক্তির শহরমূখিতা হ্রাস পাওয়া এবং গ্রামে ফেরার প্রবণতা বৃদ্ধি
- ❒ ধনী-গরীব বৈষম্য ক্রমশঃ হ্রাসের অনুকূল আবহাওয়া তৈরি হওয়া
- ❒ জাতীয় আর্থ-সামাজিক ইস্যু সম্পর্কে স্থানীয় সচেতনতার উন্মেষ ঘটা।
- ❒ ক্ষমতায়নের দিকে সাংগঠনিক ও প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা গড়ে উঠা এবং
- ❒ ব্যষ্টিক ও সামষ্টিক অর্থনীতির উভয় পর্যায়েই ইতিবাচক পরিবর্তনের সূচনা।

প্রত্যাশিত এই পরিবর্তন চাইলে আমাদের এখনই তৎপর হতে হবে। গত এক দশক হতে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির হার যে স্থবির হয়ে আছে তা বৃদ্ধির ব্যবস্থা করতে হবে। আর এ উদ্দেশ্য পূরণের জন্য প্রয়োজন হবে অভ্যন্তরীণ ভোক্তা শ্রেণীর সংখ্যা বাড়ানো যাতে দেশের উৎপাদিত কৃষি ও শিল্প সামগ্রীর বাজার বিস্তার লাভ করতে পারে এবং এক্ষেত্রে বিনিয়োগে এগিয়ে আসতে হবে সরকারী ও বেসরকারি সংস্থাসমূহকে। অভ্যন্তরীণ ভোক্তা বাড়াতে হলে দরিদ্র মানুষের সংখ্যা কমাতে হবে এবং সৃষ্টি করতে হবে স্থিতিশীল ও বহুমূখী আয় উপার্জনের সুযোগ। ভূমি তথা উৎপাদনের উপকরণে দরিদ্র মানুষের অধিকার ও নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা এবং সামগ্রীক কৃষি সংস্কার ছাড়া এ লক্ষ্য পূরণ সম্ভব নয়। অর্থাৎ একটি পরিপূর্ণ ও সামগ্রীক কৃষি সংস্কারের দিকে নজর দিলে এদেশের দরিদ্র মানুষের দারিদ্র্য অবস্থা থেকে মুক্তি দেয়া অসম্ভব কিছু নয়। একটি ন্যায্য ভূমি বন্টন ব্যবস্থাই পারে আয় বৈষম্যের মাত্রা কমিয়ে সামাজিক বিশৃঙ্খলা এবং অস্থিতিশীলতা রোধ করতে। প্রকাশ থাকে যে, বাংলাদেশের বর্তমান অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি প্রায় এক যুগ ধরে ৫ থেকে ৬ শতাংশের মধ্যে স্থবির হয়ে আছে। যদি খাসজমি হতদরিদ্র ভূমিহীনদের মাঝে বিতরণ করা হয় তবে একদিকে যেমন দারিদ্র্য দূর হবে তেমনি ভূমিহীন দরিদ্ররা বাজারে শক্তিশালি ক্রেতা হিসেবে আবির্ভূত হবে। এর ফলে একদিকে যেমন অর্থনীতির চাকা সচল হবে তেমনি প্রবৃদ্ধির হারও বৃদ্ধি পাবে।

আমরা সকলেই জানি রাষ্ট্র হলো শক্তি প্রয়োগের বৈধতার কাঠামো। এই কাঠামোতে ভূমিহীন কৃষকরা অতীতে কখনোই অধিষ্ঠিত ছিল না। ফলে রাষ্ট্র ভূমিহীন কৃষকদের অধিকার প্রতিষ্ঠায় কখনও উদ্যোগী হয়নি। তবে বিংশ শতাব্দীতে জনগণের ভোটের মাধ্যমে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের দ্বারা স্বশাসিত হবার অধিকার অর্জন ভূমিহীন গরীব কৃষকদের পক্ষে রাষ্ট্রের ভূমিকা গ্রহণকে সম্ভাবনাময় করে তুলেছিল। কিন্তু ভূমিহীনদের স্বপ্ন ভূমির উপর তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠা আজও যেমন বাস্তবায়িত হয়নি তেমনি এদেশ দারিদ্র্যের কষাঘাত থেকে এখনও মুক্তি পায়নি। এ পরিস্থিতিতে উত্তরণ মনে করে সরকার যদি রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের মাধ্যমে ভূমিহীনদের মাঝে এই খাসজমি বিতরণ করে তবে তা হবে এক ঐতিহাসিক ঘটনা এবং বাংলাদেশ হবে দারিদ্র্যমুক্ত ও দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে লড়াইরত বিশ্বের অন্যান্য দেশের জন্য উদাহরণ।

[তথ্য সহায়িকা]

সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগ (১৯৯৭) *বাংলাদেশ উন্নয়ন পর্যালোচনা ১৯৯৭: দারিদ্র্য দূরীকরণের রাজনীতি (পৃং ১০৫ - ১২৬)।*

ইসলাম, শহিদুল (২০০৯) ভূমিহীনদের কাছে ভূমি হস্তান্তর: সরকারি-বেসরকারি সমন্বিত উদ্যোগের অভিজ্ঞতা. উত্তরণ ।

ইসলাম, শহিদুল (২০০১) রায়তের অধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলন রাষ্ট্র ও রাজনৈতিক দল- প্রেক্ষিত বাংলাদেশ. উত্তরণ।

খান, আকবর আলী. (২০০৯) অর্থনৈতিক সাম্য ও আমাদের করণীয়.

পরিকল্পনা কমিশন, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার (২০০৯) দিন বদলের পদক্ষেপ- জাতীয় দারিদ্র্য নিরসন কৌশলপত্র, ঢাকা: পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়।

Bangladesh Bank Statistics. Schedule Bank Statistics (2008-2009). Dhaka: Statistics Department, Bangladesh Bank.

BBS (2009). Preliminary Report on Agriculture Census 2008. Dhaka: Planning Division.

Ministry of Finance (2010). National Budget for Financial Year 2010-2011. Dhaka: Ministry of Finance.

Betsy Hartman and James Boyce (1979) Needless Hunger- Voices from a Bangladeshi Village. New York: Food First Books.

Planning Commission, Government of Bangladesh. (2009) Millennium Development Goals Needs Assessment and Costing (2009-2015)-Bangladesh. Dhaka: Planning Commission.

বারাকাত, আবুল এবং সুভাষ কুমার সেনগুপ্ত. বাংলাদেশের খাস জমির রাজনৈতিক অর্থনীতি, জমি ও জলায় দরিদ্রের অধিকার ।

মাসউদ, এ আর. ভুমি আইন । ভুঞা, মো. হাফিজুর রহমান. যুগ পরম্পরায় বাংলার ভূমি আইন ও ভুমি ব্যবস্থা, পাকিস্তান ও বাংলাদেশ পর্ব ।

রহিম, ড. মুহম্মদ আব্দুর. বাংলাদেশের ইতিহাস ।

উমর, বদরুদ্দিন. চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বাংলাদেশের কৃষক।

মিয়াঁ, মোঃ আঃ কাদের. ভূমি জরীপ ও ভুমি ব্যবস্থাপনা।

রহমান, গাজী শামসুর. বাংলাদেশের আইনের ইতিহাস।

বাবলু, আমিনুর রহমান (২০১০) - ভূমিবঞ্চিত মানুষের ভুমি অধিকার. ঢাকা: এ এইচ ডেভেলপমেন্ট পাবলিশিং হাউজ।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার (২০০৩) ভূমি প্রশাসন ম্যানুয়াল (প্রথম খন্ড). ঢাকা: ভূমি মন্ত্রণালয়

নন্দী, গৌরাঙ্গ : হতদরিদ্রের হাতে সম্পদ হস্তান্তও, উত্তরণ ২০০৭

উত্তরণ

৪২, সাত মসজিদ রোড (তৃতীয় তলা)
ধানমন্ডি, ঢাকা-১২০৯, বাংলাদেশ
ফোন : +৮৮-০২-৯১২২৩০২
ইমেইল : uttaran.dhaka@gmail.com
ওয়েব সাইট : www.uttaran.net

সহযোগিতায়

UKaid
from the Department for International Development

মানুষের জন্য
manusher jonno
promoting human rights and good governance